ক্রোড়পত্র

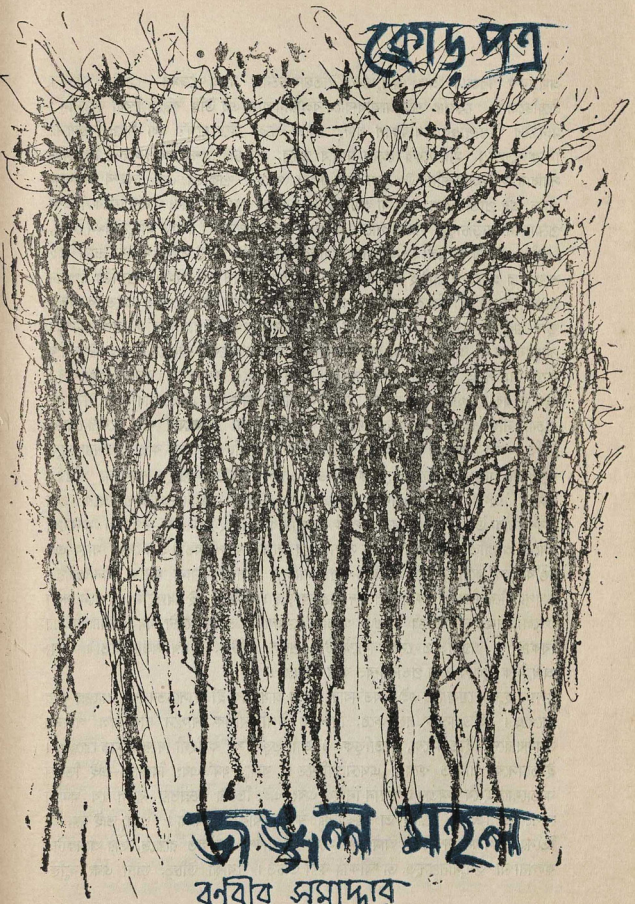

জঙ্গল মহল

রণবীর সমাদ্দার

আধুনিক বিজ্ঞান আর আধুনিক ইতিহাসচেতনার যুগে জেমস ফ্রেজার মানুষ হয়েছিলেন। ফ্রেজার তাই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এই উক্তি করতে দ্বিধা করেননি : মানুষের চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ যাদু থেকে শুরু করে ধর্মের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের দিকে গেছে। ম্যাজিকের ক্ষেত্রে মানুষ ভাবে, তার চারপাশের বিবাদ-সমস্যা বিপদের-সমাধান সে নিজস্ব শক্তির উপর ভর করে করতে পারে। প্রকৃতির এক নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে, এই প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা বা অর্ডারের উপর ভরসা করা যায়, এবং মানুষ তাকে নিজস্ব প্রয়োজনে নাড়াচাড়া করতে পারে, ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন দেখে, প্রকৃতির এই যে শৃঙ্খলা সে অনুমান করেছিল, তার বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া ভার, এই শৃঙ্খলার অস্তিত্ব পুরোটাই কল্পনানির্ভর, তার আত্মবিশ্বাস যায় কমে। প্রকৃতির পেছনে যে সব অদৃশ্য মহাশক্তি রয়েছে, তার পায়ে সে তখন নিজেকে সঁপে দেয়। এইভাবে যাদুর স্থান গ্রহণ করে ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম দিয়েও যখন পারিপার্শ্বিক বিপদ-সমস্যার সমাধান হয় না, অন্যদিকে তার চৈতন্য এবং জ্ঞান বাড়তে থাকে, তখন সে আবার উপলব্ধি করে, না সত্যই প্রকৃতির এক শৃঙ্খলা আছে ; তাকে জানা যায়, ব্যবহার করা যায়। ফ্রেজার অবশ্য এখানেই থামেননি। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা এবং আধুনিক ইতিহাস-চেতনার নজির হিসাবে এও জুড়ে দিয়েছেন **স্বর্ণভুজ** বা **গোল্ডেন বাও** গ্রন্থের শেষে, ম্যাজিক আর বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক তফাত আছে। ম্যাজিকের মূল কথা, কল্পনাপ্রসূত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব, বিজ্ঞানের মূল কথা গভীর ও বিশদ পর্যবেক্ষণপ্রসূত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব। ফ্রেজার এরপর সতর্কতাও দিয়ে রেখেছেন, যাদু→ধর্ম→বিজ্ঞান—এই যাত্রা থেকে এমন অবশ্য ভাবা উচিত নয়, পৃথিবী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণাই চরম এবং সম্পূর্ণ। মানুষের মননের অগ্রগতি যদি কালো থেকে সাদা রঙের দিকে এক পরিবর্তন হয়, দেখা যাবে এই রঙবিন্যাসের মধ্যের ক্ষেত্রটা অনেকটা সাদা কালোয় মেশানো—নানা ঘনত্বে, নানাচ্ছটায় ; তারপর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে সাদা রঙ বেড়েছে। কিন্তু এই মধ্যভূমি যেখানে সাদা কালো, আরও নানা রঙের মিশ্রিত আভাস, ফ্রেজারের ভাষায় সেটা ধর্ম ; আর চিন্তার বিকাশ বা অগ্রগতিতে সেই মধ্যক্ষেত্রটাই প্রবল, জটিল, চোখে পড়ার মতো। এবং আধুনিক যুগকেও তা প্রভাবান্বিত করে রেখেছে।১

বলা বাহুল্য, ফ্রেজারের এই বিবর্তনবাদী ধারণা আধুনিক ইতিহাসচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইতিহাসকে বহুক্ষেত্রে, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনে দীর্ঘকাল পদানত জনসাধারণের ইতিহাসকে, নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতত্ত্বসর্বস্ব কাহিনী দিয়ে দমিয়ে রেখেছে। ইতিহাসকে পরিণত করেছে এথনোগ্রাফিতে। যাদু, ধর্ম এবং বিজ্ঞান—এই তিনের কাঠামোতেই যে ক্ষমতার উপাদান নিহিত এবং এই তিনের ভিন্নতার মূলে যে ক্ষমতা সম্পর্কের ভিন্নতা রয়েছে, তা ফ্রেজারের কথায় বোঝা যাবে না। শুধু তাই নয়, এই তিনের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তার অনেকটাই কল্পনা বা অনুমানপ্রসূত, তা স্বীকার করা উচিত। বোঝা উচিত, জ্ঞান এবং যুক্তি-

ভিত্তিক জ্ঞানের সার্বভৌমত্ব বা সর্বশক্তিমান চরিত্রের উপর আস্থা রেখে আমরা এই যে সরলরৈখিক অগ্রগতির কথা ভেবে নিয়েছি, তা এক অর্থে জ্ঞানের বুর্জোয়া স্বত্ব এবং সংজ্ঞা নিরূপণকে মেনে নেয়। এইরকম ধারণা ঔপনিবেশিক শাসনে দীর্ঘকাল পদানত জনসাধারণের নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে, যে অভিজ্ঞতায় যাদু-ধর্ম-বিজ্ঞান মিলে মিশে রয়েছে ; যে জনসাধারণের সংস্কৃতি শাসক-ক্ষমতার বিরুদ্ধে সক্রিয় থেকেছে যাদুধর্ম দিয়ে ; যে অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে আধুনিক জ্ঞানের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে অন্য এক যৌক্তিকতা মখোমুখি। এই ভিন্নতর, প্রতিবাদী, অন্যতর যৌক্তিকতাকে 'যাদু' বা 'ধর্ম' নাম দেওয়াও এক ধরনের চক্রান্ত। আধুনিক ইতিহাস থেকে এই অন্য ইতিহাসকে মুছে ফেলার এক প্রয়াস।

জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির যে উপকথা এখানে লিখতে যাচ্ছি, এটা সেই অন্য ইতিহাসেরই একটা দিক। সংস্কৃতির কড়চা লেখা আমার সাধ্যের বাইরে, সে নিয়ে অনেকে লিখছেন, লিখেছেনও। সংস্কৃতির রাজনীতি আর রাজনীতির সংস্কৃতি লেখার এটা একটা চেষ্টা। জঙ্গলমহলের একটা নির্দিষ্ট যুগকে অবলম্বন করে, একটা নির্দিষ্ট মহালকে জড়িয়ে। ঔপনিবেশিক শাসনের কালে এই শতাব্দীতে জামবনি পরগনা—সে যুগের ভাষায় মহাল জামবুনি। সংস্কৃতির এই কাহিনী, আমি আগেই ইঙ্গিত করেছি, ফ্রেজার বর্ণিত মানবীয় চৈতন্যগতি সম্পর্কিত বক্তব্যের বিপরীতে যাবে। উপজাতি বা ট্রাইবদের ম্যাজিক ইত্যাদি নিয়ে গল্প এখানে নেই ; আছে 'যাদু'-'ধর্ম'-'বিজ্ঞান' ইত্যাদি অভিধা যে বিষয়গুলির ইঙ্গিতবাহী, তার এক মিশ্র জগত নিয়ে কথা—ক্ষমতার বিন্যাস যেখানে মূল উপজীব্য। আর আছে আধুনিক ইতিহাসচৈতন্য কিছু ভাবনা, যার সার কথা—এ কোন আধুনিকতা, কোন ঐতিহাসিক চৈতন্য যা সংস্কৃতির এই আলোচনাকে এথনোগ্রাফিতে ঠেলে দিয়েছে, ইতিহাসের আঙিনা থেকে বার করে দিয়েছে অন্য এক ইতিহাসের পৃথিবীতে ? এই নিয়ে লিখতে বসে একথাও মনে হয়েছে, আধুনিকতা যেভাবে ইতিহাসকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে তার দমবন্ধ করার উপক্রম করেছে, তাতে ইতিহাস দিয়ে আচার, সংস্কৃতি, ক্ষমতার এই পরিমণ্ডলকে সামনে টেনে আনা কি আদৌ সম্ভব হবে ?

১

লিখছি যদিও সত্তর আশি থেকে একশ বছর আগের ব্যাপার নিয়ে, একেবারে হাল আমলের একটা ঘটনা দিয়েই শুরু করি। হাল আমল বলতে একেবারে হাল, এই গত বছর।

জামবনির 'রাজা' বা জমিদারের সদর কাছারি আর রাজবাড়ি ছিল চিলকিগড়ে। এখনও মূল বাড়িটি অক্ষুণ্ণ। কাছারিবাড়ি একেবারে ভেঙে গেছে। চিলকিগড়ের বিখ্যাত কনকদুর্গা মন্দিরের পাশে পুরনো মন্দিরটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই চিলকিগড়ে শিবের গাজনের সময় যে নাচ হয়, তা হল 'ছো'। 'ছো'র অর্থ সঙ। বিশেষ ঢঙে বা ভঙ্গিতে এই নাচের সময়ে চিলকিগড়ে কাঠের তৈরি মহড়া বা মুখোশ আর 'পরভা' ব্যবহৃত হয়।

চিলকিগড়ের ছো-এর এক বিশিষ্ট অঙ্গ হল 'পরভা'। একটা কাঠ থেকে তৈরি প্রায় প্রমাণ আকারের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিকে বলা হয় 'পরভা'।

চিলকিগড়ের ছো-এর কথা এই আখ্যানে পরে আসবে। আপাতত হাল আমলের ঘটনার কথা বলতে গিয়ে যেটুকু এখানে লেখা দরকার, সেটুকু বলি। এই ছো নাচে বারোটি পরভা থাকে। প্রত্যেকের দুটি করে বাহন। গৌরাঙ্গ আর পা-পিয়াদা বা অষ্টভুজা। পরভার নাচে ঢাক আর সানাই বাজে, শুধু দুটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ঢোল আর সানাই। এই ঘরানার নাচ কবে কোথায় শুরু হয়েছিল, আজও তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। অনেকের ধারণা, ধলভূমগড় থেকে রাজা মানগোবিন্দের আমলে ১৮৪০ নাগাদ এই নাচ জামবনিতে আসে। মানগোবিন্দের বাবা কমলাকান্ত দৌহিত্রসূত্রে ১৮২২-এ ইংরেজদের কাছ থেকে পাট্টা পেয়ে জঙ্গলমহলের বর্তমান জামবনির রাজা হন। কমলাকান্ত ধলভূমগড় রাজবংশের উত্তরাধিকারী, বিখ্যাত জগন্নাথ ধবলদেবের বংশধর। সুতরাং ধলভূমগড়ের সাথে এই ছো নাচের যোগসূত্র খুবই সম্ভব।

এই নাচের প্রকাশভঙ্গি সহজ সরল আর স্বচ্ছন্দ। এতে আছে তালের নানা রকমফের আর বহু ছন্দের বাজনা। একটি 'পরভার' সঙ্গে তার নাচ আর বাজনায় বৈচিত্র আছে। দেখেশুনে মনে হয়, নাচের অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং নাচের কথকতার বিষয় মাথায় রেখে বাজনার ধ্বনিকাঠামো রচিত হয়েছে। নাচের অঙ্গভঙ্গিতেও বিভিন্ন চরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটে। সর্বজনীন অনুভূতি যেমন এই কথকতায় প্রকাশিত, তেমনই আছে দেবতা, মানুষ, পশুপাখি, নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। যাইহোক চিলকিগড় রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় গাজনের সময় শতাধিক বছর ধরে এই নাচ অনুষ্ঠিত হতো। রাজার বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায়, উপস্থিতিতে, আশির্বাদে এবং আনুকূল্যে এবং প্রজাকুলের দর্শক হিসাবে আগমনে গাজনের এই উৎসব হতো। নাচের দল আর মহড়া তারপর একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে গাঁয়ে গাঁয়ে যেত। গাজনের সমাপ্তিতে এই মহড়ারও সমাপ্তি হতো। তারপর জমিদারি উচ্ছেদ হল। ধীরে ধীরে পৃষ্ঠপোষকতায় টান পড়ল। অর্থনৈতিক অক্ষমতা, গাঁয়ের নতুন পয়সাওয়ালা লোকেদের উদাসীনতা, ভিডিও কালচারের অনুপ্রবেশ এবং সর্বজনীন নিষ্পৃহতায় এই ছো নাচ আশির দশকে প্রায় লুপ্ত হল।২

বোলগুলো হারিয়ে যেতে লাগল। সত্তরোর্ধ্ব কয়েকজন নৃত্যশিল্পী বেঁচে রইলেন, যাঁরা নাচের ছন্দ জানেন। উৎসাহ যদি বা থাকে, শেখানোর কেউ নেই ; শিক্ষক থাকে তো রেস্ত নেই। খালি পরভাগুলো টিকে রইল সুরক্ষিত অবস্থায় রাজবাড়ির এক ঘরে। রঙগুলো প্রায় অমলিন, একশ বছর আগে লেখা। তারপর এক-আধবার রঙের প্রলেপ তাতে চড়েছে। কিন্তু এখন এ মুখোশশিল্পীও আর নেই। এই সময় জমিদারবাড়ির আর বাইরের গুটিকতক লোকের শুভেচ্ছায় চিলকিগড়ে গঠিত হল 'লোকযানী'। উদ্দেশ্য সাধু, লুপ্তপ্রায় এই লোক-ঐতিহ্যকে বাঁচানো। এই উদ্দেশ্যের অংশরূপে ১৯৯১-এর ৪ আর ৫ নভেম্বর চিলকিগড়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

নৃত্য, নাটক, সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি। তাদের উদ্দেশ্যও সমান সাধু। চিলকিগড়ের গৌরবমণ্ডিত ছো নাচের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। অনুষ্ঠিত হল 'ছো' আর 'আদিবাসী' সংস্কৃতি নিয়ে কর্মশালা ও আলোচনাচক্র, পরিশেষে নৃত্যানুষ্ঠান। আমাদের অভিজ্ঞতার শুরু সেই উপলক্ষে।

অনুষ্ঠান আর আলোচনাচক্রের আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা তিন বন্ধু গেছিলাম চিলকিগড়ে। গিয়ে দেখি উদ্যোক্তা হিসাবে আছেন জমিদারবাড়ির দুচারজন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, একজন বর্তমান অধ্যাপক এবং আকাদেমির সম্পাদক। গিয়ে শুনি আকাদেমি যা টাকা দিয়েছেন, তাতে অনুষ্ঠানের ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়, প্রবীণ ছো শিল্পী শশধর রায়, বালক দেহারি এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক শিল্পীরা কোনও পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক পাবেন না। শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত কিছু ক্ষত্রিয়, মাহাত এবং সাঁওতাল। জেনারেটর এসেছে, নানা প্রতিশ্রুতি সাড়ম্বর ঘোষিত হচ্ছে। শশধর, বালক দেহারি আর অন্যান্য শিল্পীরা মঞ্চে নেই, নিচে কাঠের চেয়ারের পেছনের সারিতে বা মাটিতে। মঞ্চ বলতে জমিদারবাড়ির উঁচু দালান, নিচে আমরা—শ্রোতা, দর্শকরা।

লোকসংস্কৃতি বাঁচানোর আর পুনরুদ্ধারের এই যজ্ঞের আচারগুলো আমাদের চোখে লাগল বা চোখে পড়ার মতো। আকাদেমির সচিব এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনারা সব সমাজবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র থেকে এসেছেন, কিছু বলুন। আমরা বললাম, শুনতে এসেছি। এ নিয়ে কিছু জানি না। কিন্তু অনুরোধ উপরোধ চলতে লাগল। তারপর ভদ্রলোক নিজেই বলতে শুরু করলেন :

এই আনায় এখানে আসতে হচ্ছে, এত বলতে হচ্ছে ; এদের বাঁচাতে হবে তো! এই তো জলপাইগুড়ি গেলাম। ওখানেও একই সমস্যা। শিল্পীরা খেতে পাচ্ছে না। নাচবে গাইবে কি করে! ব্যবস্থা করে এসেছি। ব্যবস্থা করেছি ব্যাংকের সাথে। ওদের বাঁচিয়ে দিলাম।

এঁদের পারবেন ? আমাদের তির্যক প্রশ্ন।

এই তো, এবারে এসেছি, ধরেছি। এদেরও বাঁচিয়ে দেব। এই তো মিউজিয়ামের লোকজন এসেছে। ছবি তুলছে। সব রেকর্ডও করে নিচ্ছি। এদেরও ব্যবস্থা করে দেব। সচিব মশায়ের আত্মবিশ্বাস, ত্রাতার ভূমিকায় তার এই চেহারা আর দাপটে তখন আমরা আধুনিক পৃষ্ঠপোষকতার অন্য এক রূপ দেখতে শুরু করেছি। অবশ্য তখনও বুদ্ধিজীবি লোকসংস্কৃতির আধুনিক পৃষ্ঠপোষকতা দেখার এখনও বাকি আছে।

পরের দিন সকালে কর্মশালা শুরু। জীবন্ত বিবরণ দেওয়া শক্ত। তবু চেষ্টা করব। দালানে, যেটা এখন কর্মশালার প্রদর্শনীমঞ্চ, সেখানে দর্শকদের দিক থেকে দেখলে বাঁ দিকে টেবিল চেয়ার ফুল ইত্যাদি। এই চেয়ারে বিব্রত উপাচার্যমশাই, পাশে প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকদ্বয়, তারপর সচিবমশাই। মাইকে শেষ জমিদার জগদীশচন্দ্র ধবলদেবের দুই ছেলে বিমলেশ এবং নির্মলেশ লোকশিল্পীদের ডাকছেন নাম ধরে আর

নিজেরাও বিস্মৃতপ্রায় গানের কলি, ঢাকের বোল, নাচের তাল ধরছেন। শিল্পীরা একের পর এক নাম ডাকায় উঠে আসছেন, নমুনার প্রদর্শনী হচ্ছে। একাধিক ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, টেপের চাপা আওয়াজ আর লোকসংস্কৃতি উদ্ধারকর্তাদের তৎপরতা। এরই মাঝে সচিবমশায় নাচের মুখোশ উল্টো দিক থেকে ধরে একজন শিল্পীর যেই নাম ডেকেছেন, অমনি রাজবাড়ির একজনের সোচ্চার তিরস্কার,

ঠিক করে মুখোশ ধরতে জানেন না, লোকসংস্কৃতি বাঁচাবেন? এতে মুখোশ নষ্ট হয়ে যাবে!

কর্মশালায় অন্য একজনের বক্তৃতা, লোকশিল্পী আর মুখোশ কারিগরির অর্থনীতি। বলা বাহুল্য উপবিষ্ট সবাই হাঁ করে তাকিয়ে।

এরপর জোরকদমে নাম ডাকা শুরু হল। একজন নৃত্যশিল্পী এগিয়ে আসতে প্রশ্ন,

তোমার নাম কি?

আজ্ঞে, বিশু সাঁওতাল।

বয়স কত?

নীরবতা; তারপর, জানিনা।

তুমি নাচো কেন?

নীরবতা।

কি কর?

আজ্ঞে, জনমজুর আমি।

এইভাবে রোলকল চলছে। নমুনার প্রদর্শনী হচ্ছে। রেকর্ডিং, ছবি, সব উঠছে। মাঝে মাঝে কলকাতার কাগজগুলোর রিপোর্টারদেরও (সন্দেহ, কেউ কেউ র‍্যাডিকাল রিপোর্টার) নানা প্রশ্ন। আর মঞ্চে এসে দেখিয়ে নেমে যাচ্ছেন শিল্পীরা, বসে থেকেছেন নৃতাত্ত্বিক, অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি-প্রেমিক পৃষ্ঠপোষকেরা। এপাশে পেছনে চাপা গুঞ্জন। চা পাইনি, খাবার পাইনি। এত কম টাকায় সম্ভব নয়। নাচের শাড়িটাও দিয়ে দিল না। মজুরি পেলাম না। জানি না এই গুঞ্জনের জন্যই কিনা, সহসা নাটকীয়-ভাবে সচিবমশাই ঘোষণা করলেন, মাত্র ৮০০০ টাকায় এ কর্মশালা হয় না, তাঁরা জানেন। আরও বরাদ্দ তাঁরা মঞ্জুর করবেন। বলা বাহুল্য, এর অনেকটাই গোছিল পেট্রল আর খাওয়াদাওয়াতে।

পরেশ ধল জামবনির পুরনো লোক। এখন বয়স সাতাত্তর। স্মৃতি হাতড়ে জানালেন, বারোটি পরভা বারোটি দেবতার। গণেশ থেকে যম—সব আছে। মানগোবিন্দ চেয়েছিলেন, এ নাচে মতেই দেবতা-মানুষের মিলন হোক। তাই নাচে যদিও ঘুরে ফিরেই সারারাত ধরে এসেছে লোকজীবনের নানা সংগ্রামের কথা—জঙ্গল কেটে বসত করতে গিয়ে গ্রামবাসীকে সিংহ, বাঘ, ভালুক, অন্যান্য বন্যজন্তুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হচ্ছে, একটি নারী (শক্তি) একাই একটা নেকড়ে নিধন করছে, ঝাঁটা দিয়ে একজন সকল অমঙ্গল দূর করছে, তাঁতি, জেলে, চাষি—সবাই এই সব নাচে কুশীলব হয়ে আসছে

—কিন্তু এই লোকজীবনে দেবতার আশির্বাদ থাকছেই, তাই জমিদার মানগোবিন্দ প্রবর্তিত-পরভা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আশির্বাদ লোকসংস্কৃতির মাথায়। এমনকি সতীপালাও এসে গেছে ছো-এর কথকতায়।

পৃষ্ঠপোষকতা যিনি বা যাঁরা করছেন, আর যাদের সে অনুগ্রহ লাভ করতে হচ্ছে, চিলকিগড়ের ছো নাচের পালাকে ঘিরে তাদের ওঠা, বসা, দেখা ইত্যাদির যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বন্দোবস্ত, সেই বন্দোবস্ত বা প্রোটোকলের কোনও ভেদ পাইনি এ যুগের 'লোকসংস্কৃতি বাঁচাও' এর অনুষ্ঠানে। তাই মনে হয়েছিল ক্ষমতার যেমন কিছু আচার আছে, শাস্ত্রীয় ভাষায় তার কিছু ক্রিয়াকলাপ, তেমনই এই আচারেরও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষমতা আছে। নতুবা এই ক্রিয়াকলাপের আবহমানতা থাকছে কী করে ?

২

চিলকিগড়ের ছো নিয়ে অবশ্য খুব বেশি লেখালেখি হয়নি। এই রেওয়াজ প্রায় মরেই গেছিল। তারপরে পাকচক্রে সেই মৃত শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার উদযোগের সাক্ষী হয়ে গেলাম, সে কথা অন্যত্র লিখেছি। প্রশ্ন হল ছো নাচে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব এল কী করে ? সরাইকেলা বা পুরুলিয়ায় এই পালায় চিরায়ত নৃত্যের যে প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, এটা ঠিক যে চিলকিগড়ের সঙে তা নেই। গ্রাম্যজীবন ও লৌকিকতার ছাপ এখানে অনেক বেশি। বিমূর্তায়ন অনেক কম। কিন্তু অন্যদিকে রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে পালায় সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে পুরুলিয়ায় বা সরাইকেলার ছো নাচে বিমূর্তায়ন। চিলকিগড়ে বিমূর্তায়ন কম, তাই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবও অধিক লক্ষণীয়।

বড় প্রশ্ন, ছো-এর মুখোশ এখানে পরভা হল কী করে ? এক দিকে রয়েছে গণকঠাকুর, বুড়ি, ভালুক, কাক, কালিকা, বাঁদর, বাঘ, ভূত—এর একটা পরম্পরাও পালায় রয়েছে—একটা অর্ডার; আর এই শৃঙ্খলার প্রথমে বা শীর্ষে থাকছে দেবতার প্রভা। মেল আছে, জাগরণ আছে। সারারাত প্রজাদের জাগতে হবে দেবতা, মানুষ আর মানবেতর জীবের মিলনোৎসবে। রাজা দেখবেন। অন্তপুর থেকে দেখবেন রাজবাড়ির মেয়েরা-বউয়েরা। মাহাত বউ, সাঁওতালনি, বাগদি-বউ—এঁরাও দেখবেন। সীমানা থেকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণপ্রধান, মনে রাখতে হবে উৎকলব্রাহ্মণ প্রধান, গ্রাম দুবড়া থেকে সঙ বেরুবে। বৈশাখে কেদুয়া, জ্যৈষ্ঠে চিলকিগড়। তারজন্য আখড়া বসবে আগে থেকে। আলমপুরের ঢাকি, দুবড়ার বাজনদার। শিবের এই জাগরণে মানত আছে, উপোসও আছে। রাজবাড়ির মাহুত ইন্দ্র নায়েক যাবেন আগে আগে। দীর্ঘদিন ধরে সানাইদার ছিলেন দুর্গা কালিন্দী, ঢুলিদার রাজবল্লভ কালিন্দী, নাচতেন নরেন রায়, তাঁর ছেলে শশধর রায়, বালক দেহরী, সমরেন্দ্র ধবলদেব। মূলত দণ্ডচ্ছত্র মাঝিদের অংশগ্রহণে এই নৃত্যানুষ্ঠানের মাঝে সাঁওতাল, বাউরি, মাহাত—এঁদের জায়গা হতো না। তাঁরা দর্শক। শিল্পীরা রাজবাড়ির একঅর্থে কর্মচারী। তাঁদের ক্ষেত্রে বাস্তুকর ছাড়, জঙ্গলকর ছাড়। ব্রত, পুজো, জন্মমৃত্যু, রানিমার ভোজন, গানবাজনা, স্ত্রীআচার, জাতবিচারসম্পন্ন

মেলামেশার কাঠামো, কাঙালিভোজন, ঝুমুর, নাচনিপ্রথা, টুসু—অনেক কিছুই ছিল জামবনিতে কিন্তু এর মধ্যমণি চিলকিগড়ের ছো। সংস্কৃতির গোটা ক্ষেত্রটা নিয়ে অনেক বলা যায়, অনেক বিশ্লেষণ হতে পারে; কিন্তু মনে দাগ কাটে, এক ঝলকে গোটা চেহারাটা তুলে ধরে এই মেলা আর সমাবেশ—যে চেহারার আসল কথা ক্ষমতা আর আচার। বার্থের ভাষায় প্রথমটা **স্টাডিয়াম,** পরেরটা **পাংকটাম**। প্রথমটার দাবি, পর্যবেক্ষণ, অভিনিবেশ, রচনা; পরেরটায় বৈশিষ্ট্য প্রতিক্রিয়া ঘটনার সূচীতীক্ষ্ণ ক্ষমতা, সহসা প্রভাববিস্তার করার ক্ষমতা, সংস্কৃতির বাকি ক্ষেত্রটায় আলোকসম্পাত করা তার কাজ। একটা পর্যবেক্ষণ করায়, অন্যটা ভেদ করে।[৪]

যাইহোক, এই পরভাগুলো ঠিক মুখোশ নয়। মুখোশ মানুষের, পরভা মানুষের চেয়ে বড়। অনেক বড়। ভারি। তাকে ধরে রাখতে হয়। সামনে নাচে মুখোশপরা একটি চরিত্র। মানুষ বা পশুরূপী। পরভার আড়ালে থাকে আরেকজন। পরভায় এই বিশাল মাত্রার সামনে হ্রস্ব আকারে নাচতে থাকে সহযোগী চরিত্রটি। বড় গাছের তলায় চারপাশে বেড়া দিয়ে থাকে নাচের আঙিনা। তারপর সামনের সারিতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তারপর দশর্কেরা। মুখোশশিল্পী আর নৃত্যশিল্পীর মিলনে এই নাচ। মুখোশে রঙ আছে। কাঠখোদাই করে রঙ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই পরভার প্রচলন এতটাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিনির্ভর ও রাজপ্রসাদপুষ্ট যে চিত্রেশ্বরের পর এই ধরনের কারুশিল্পীরাই নির্খোজ হয়ে গেছেন। আমি অনেক খোঁজ করেছি, এঁদের হদিশ পাইনি। উৎসবের চাহিদায় এই কারুশিল্প। মুখোশের যেমন আচারের দিক, তার অলংকার, সজ্জা বা কারুকার্যের দিকও রয়েছে। কিন্তু উৎসবের আচারের দিকটা যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে অলংকারের দিকটাও যায় কমে। আস্তে আস্তে সঙ-এর যাত্রাপথ বা রুটও ক্ষীণ হয়ে আসে। অলংকারের বিবর্তন যায় বন্ধ হয়ে। রঙ করার পদ্ধতিও পাল্টায় না। তাই পুনরুজ্জীবিত লোকসংস্কৃতির এহেন নমুনা দেখে সন্দেহ জাগে, পরভার ঢঙে মুখোশ কীসের মুখোশ? দেবতাকে ঢেকে রাখছে দেবেতর জীবের সামনে? নিশ্চল সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আচারকে ঢাকতে চাইছে? মানুষের ওপর দেবতার প্রাধান্যকে? প্রজাকুলের উপর রাজা চিত্রেশ্বর ও পরবর্তী ধবলদেবদের প্রাধান্যকে? এও মনে হয়, কেন চার, পাতা, পাইক, ঝুমুর ইত্যাদি নাচ জনপ্রিয় হয়ে টিকে থাকল, আর চিলকিগড়ের ছো টিকলনা?

চিলকিগড়ের ছো-এর মুখোশ নিয়ে আরো কিছু কথা আছে। আমি আগেই বলেছি, এই নাচ আর মেলার একটা অর্ডার বা ক্রমানুক্রমিক শৃঙ্খলা আছে। দুবড়া থেকে পালা আসে চিলকিগড়ে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবের নিদর্শন নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি অন্যত্র রঙ্কিনী থেকে কনকদুর্গায় মাতৃদেবীর উত্তরণের কথা বলেছি। দুবড়া থেকে চিলকিগড়—এভাবে যে পালা রাজবাড়িতে পৌঁছায়, সম্ভবত তা এই অর্ডারেরই একটা চেহারা। চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত দুবড়ায় হতো মুখোশ নাচ—শিবদুর্গা নৃত্য, রাধাকৃষ্ণ নৃত্য, বাবু পালার নাচ। মহড়া মানে মুখোশ নাচ।

কিন্তু কার সাথে মহড়া ? আলো হিসেবে জ্বলত মশাল। নাচের সঙ্গে ঘুরত মশাল। এখানেও দণ্ডছত্র মাঝি, সদগোপ, সামন্তরা নাচতেন। বাজনদার হতেন ডোমরা। চিলকিগড়, বেড়া, বেলিয়া, জামবনি, কেন্দুয়া, পালবাঁশি, নিমডিহা, বনকাটি ইত্যাদি নানা গ্রাম থেকে লোক আসত দুবড়ায়। জমিদারও যেতেন। ধোপারা ধরতেন মশাল। এইখানে পালা শেষ হলে তারপর জামবনি হয়ে চিলকিগড়। মাঝে বেলিয়ার হাট। তারপর জ্যৈষ্ঠে সঙ পেঁছত চিলকিগড়ে।

'ছো' মানে সঙ সাজা, ঢঙ করা। কিন্তু 'ছো' মানে হেম বড়ুয়ার ভাষায় ছায়া, আকৃতি। অসমিয়া অভিধানের মতে দেবতা, জন্তু ইত্যাদির আকৃতি। তা হলে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন থেকেই যায় ; মহড়া কীসের ? মহড়া মানে রিহার্সাল ? যুদ্ধের প্রস্তুতি ? নাচের প্রস্তুতি ? প্রভা কীসের ? মানুষের ওপর দেব-দেবীর ? পরভার সামনে যে নাচে সে 'কনিয়া-ছো'। মানে 'কনে-ছো' ? অর্থাৎ কনে সেজে চলেছে ? অর্থাৎ ছোট ছো ? প্রাধান্য মেনে নিয়েছে ? কিন্তু, নাচের এই যদি এক শৃঙ্খলা হয়, অন্য একটি হল তার উদ্বোধন আর সমাপ্তির রুট। ব্রাহ্মণের আশির্বাদ পেয়ে তবেই আসবে রাজ আলয়ে। তার তৃতীয় শৃঙ্খলা হল পালার অনুষ্ঠানের ক্রমানুক্রম। এই শৃঙ্খলা দেখলেই বোঝা যায়, লোকায়ত এবং উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক উপাদান চিলকিগড়ের ছো-এ কেমন মিলে মিশে আছে। গাজনের সন্ন্যাসী হল ভক্তা। শিবের উৎসবে স্থানীয় ধর্মীয় লোকাচার পালিত হয়। ডুলুঙ-এ ভক্তরা স্নান করত। এখনও কেউ কেউ করে। তারপর ব্রাহ্মণ, ঢাক-ঢোল-সানাইবাদকের সামনে তাদের ভর হয়। সারা গায়ে সিঁদুরের দাগ মেখে কোমরে ঘুঙুর, পরনে ঘাঘরা—এইভাবে শিবের ভক্ত কাঁঠাল গাছের পাতা আর ফল কাটে। ফল গ্রামের লোকদের মাঝে বিলি হয়। সামনে ছাগল পড়লে ছাগলও বলি হয়ে যেত। এইভাবে শিবের 'পাঁতা'র সঙ্গে নাচত 'রঙ্কিনী পাঁতা', 'কালিকা পাঁতা', 'দুর্গা পাঁতা'। পেছনে যেত দর্শক ও ভক্তমণ্ডলী—গ্রামবাসী আর ব্রাহ্মণেরা। এইভাবে শিব, রঙ্কিনী, কালী এবং 'সংস্কৃত' রূপে মাতৃদেবী দুর্গার আরাধনার পর শুরু হতো ছো এর আসর। সঙ্গে থাকত ব্রাহ্মণের আশির্বাদ, জমিদারের প্রসাদ ও পৃষ্ঠপোষকতা। নাচের আসরে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রভা, লোকায়ত জীবনের ছায়া সেই প্রভার আলোয় বা ছত্রছায়ায়। চিলকিগড়ের দুদিনব্যাপী রতি নাচের প্রথম রাত হতো 'সতীর-রাত', পরের রাত 'জাগরণ'। কিন্তু সতীপালা ঢুকল কী করে ছো এর আসরে ? সতীঘাটা নামে মৌজা আছে।

ছো-এর আসরে সতীর অনুপ্রবেশ ঘটলেও তার ব্রাহ্মণ্য দিকটিই সব নয়। কারণ, শতাধিক বছরের বেশি চলে আসা এই পালায় 'মেল' বা সতী অনুষ্ঠানে, যেখানে মৃতদেহের প্রতীক হিসাবে আসরে একটা খাট চাদর চাপা দেওয়া থাকে, সেখানে সতী-প্রথার গৌরব প্রচার করার থেকেও করুণ সুর বেশি বাজতে থাকে। সতীপালায় লোকশিল্পী করুণ সুরে গান গাইতে থাকেন। সতী সাজেন সাধারণত একজন লালপাড় শাড়ি পরা পুরুষ। হাতে আমের পাতা। জলে চুবিয়ে সেই পাতায় জল ছিটানো

হয়, যেন পথ পবিত্র করে সতী চলেছে। সতীরাতের পরের দিন সকালে সতীকে নিয়ে গ্রামবাসী বেরিয়ে পড়েন, গ্রামের বাড়িগুলোয় যান। সঙ্গে ঢাক, ঢোল, সানাই, পতাকা। বউয়েরা সিঁদুরকৌটো বার করে সতীকে টিপ পরিয়ে দেয়। সতী এইভাবে গান গেয়ে এগিয়ে যায়। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগৃহীত চিলকিগড়ের দুটি সতী গানের নমুনা দিতে পারি।[৫]

১

আমি কি করিব, কোথা যাব, বলো না গো দূতী,
আমার পরাণ মারিয়া সইলো, বাড়ালেন পিরিতি ॥

২

আমি নিরজনে শ্যামের সনে, গেঁথেছিলাম মালা,
আঁখি দুটি পালটিতে, ছেড়ে গেলেন কালা ॥

'ছো'-এ কী করে সতী এল, সতীগান চিলকিগড়ের কৃষক, খেতমজুর—এদের মধ্যে কীভাবে জনপ্রিয় হল, এ নিয়ে জামবনিতে আমার বারংবার ভ্রমণকালে নানা লোককে প্রশ্ন করেছি : সদুত্তর পাইনি। সতীদাহ এক-আধটা হতে পারে, কিন্তু তার জন্য ছো নাচে, গাজনে এই অন্তর্ভুক্তি কীভাবে সম্ভব হবে? হলফ করে বলতে পারি না, কিন্তু মনে হয় লোকজীবনের নানা দিক নিয়ে যেমন নাপিতের ছো, শিকারি ছো ইত্যাদি হয়েছে, করুণরসের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে সতীপালা দিয়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়েও একটি পালা আছে। নাম 'ছা-সোহাগি'। হয়ত, সতীগান সতী হবার গৌরবগাথা নয়, বরং লোকজীবনে নারীকে নিয়ে করুণরসের এক অভিব্যক্তি। এবং এও মনে রাখা দরকার, শুধু শাসকসংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতিকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে না, এই অন্তর্ভুক্তি ঘটে বিপরীত দিক থেকেও। লোকসংস্কৃতিতে লোকজীবনের নানা অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রকাশগুলিকে অবলম্বন করে। সম্ভবত গ্রামসি কথিত 'আধিপত্য'-এর সাংস্কৃতিক প্রতিফলন ঘটে এভাবেই!

সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তির পারস্পরিক চরিত্রটি আরও ভাল করে বোঝা যায়, ছো এর পূর্বাপর শৃঙ্খলা লক্ষ করলে। লেভি স্ট্রাউস আমেরিকার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের জনজাতিদের মুখোশ নিয়ে গবেষণাকালে দেখিয়েছিলেন কোয়াকিউটল জনজাতি এবং তাদের সালিশ প্রতিবেশীদের মধ্যে আদানপ্রদান ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করে কোয়াকিউটলদের মুখোশগুলি। লেভি স্ট্রাউসের মতে মুখোশ রহস্যময় মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এই রহস্যের আঁধার ছিন্ন করা যায়। এবং আঁধার ভেদ করার চাবিকাঠি মুখোশের 'লুক্কায়িত চিহ্নগুলি'র মধ্যে রয়েছে।[৬]

জঙ্গলমহলের, বিশেষত জামবনির মুখোশনাচের 'লুক্কায়িত চিহ্নগুলি' আমি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি। মুখোশের গড়নে, রঙে, নমনীয়তায় এবং মুখোশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে এই লুক্কায়িত চিহ্নগুলি রয়েছে। কেন একটা সিরিজ বা ধরনের মুখোশের কাঠামোয় বৃহদাকৃতি, যা আধিপত্যের কথাই শুধু মনে করায়? কেন অন্য ধরন বা

সিরিজের মুখোশগুলি ছোট, রঙ অত সোচ্চার নয়, নমনীয়তার ভাব অনেক বেশি ? উড়িষ্যাগত ব্রাহ্মণকুল, সেই সব ষড়ঙ্গী, শতপথীরা, ক্ষত্রিয়সমাজ, যাদের কুলপতি সেই দেও ধবলদেবেরা, তারপর ভূমিজ, মাঝি, মাহাতকুল আর অন্তে সাঁওতাল, শবর, বাগদি, মালিরা—এই ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন সম্পর্ক কাঠামো চিলকিগড়ের ছো আসরের শৃঙ্খলায় রয়েছে। এই আসরে সবাই অংশ নিচ্ছে—এক একজন এক-একভাবে। এই অংশগ্রহণের মধ্যে দুটি ভাবই নিহিত—সমবেত ভাব আর সম্মানের প্রকারভেদ।[৭]

আমি কালচারাল পেট্রনেজ বা সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেই কথায় ফিরে আসা যাক। এই ছো আসরের স্মৃতিচারণ হলেই, আমি লক্ষ করেছি, জনমানসের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে জাঁকজমক, সারারাতব্যাপী সমবেত অনুষ্ঠান, রাজবাড়ির উপস্থিতি, দাক্ষিণ্য আর বৃহদাকৃতি মুখোশ বা পরভার কথা। নাচিয়েরা কেমন নাচত, খোরপোষ পেত—সে সব কথা। এখানে অনুষ্ঠানের আচারের দিকটাই বড় হয়ে রয়ে গেছে। কালজয়ী হয়েছে। জঙ্গলমহলের জমিদারিপ্রথার রাজনীতি এখানে আচারকে ধরে টিকেছে এবং আচারই সময়ে সময়ে জমিদারদের কৃষক রাজনীতির মূলে অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজা প্রজারই, রাজা প্রজাদের সংস্কৃতিকে মান্য করে, সংস্কৃতির শিখরে রাজার পৃষ্ঠপোষকতার ছত্র, সমবেত শ্রোতৃ বা দর্শকমণ্ডলী হল জামবনির সমাজবদ্ধ জনতার, জঙ্গলমহলের এই পরগনা আর গোটা জঙ্গলমহল তার সংস্কৃতির গণ্ডী দিয়ে গাঙ্গেয় বাংলা বা উড়িষ্যা থেকে আলাদা—এই সত্তাবোধ বা পরিচিতিবোধ শতাধিক বছর ধরে চলে আসা ছো আসরকে জনমানসে এনে দিয়েছে। এর নাটকীয়তা, ভাষণিক রূপ, প্রদর্শনীর কাঠামোগত শৃঙ্খলা—সব মিলিয়ে জেমস স্কটের ভাষায় বলা যায় পাবলিক ট্রানসক্রিপ্ট অব দ্য ডমিন্যান্ট বা প্রাধান্যের প্রকাশ্য চিত্রনাট্য।[৮] এই চিত্রনাট্যের প্রকাশ্যতার মূলে বিষয় মর্যাদা, প্রভাব, নাটকীয়তা এবং সমবেত সংস্কৃতির এক অতিকথাময় রূপ।

৩

শ্বেতাঙ্গ নৃতত্ত্ববিদ্যার নজিররূপে ফ্রেজারের মতের উল্লেখ আগে করেছি। লেভি স্ট্রাউসের বক্তব্যের সারমর্ম অন্তত এক অর্থে এর থেকে খুব দূরে নয়। প্রকৃতির উপর সংস্কৃতির জয় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে লেভি স্ট্রাউস দেখিয়েছেন মুখোশ কীভাবে পালটাচ্ছে। মহাজগতের দৈত্যদানবের ভয়াবহতা সরে যাচ্ছে মুখোশ থেকে ; সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত সম্পর্কবোধ স্থান গ্রহণ করেছে। সভ্যতার উদয় হচ্ছে। **মুখোশের নানা কণ্ঠস্বর বা নানান রকমফের** (ওয়ে অব দ্য মাস্কস)-এ লেভি স্ট্রাউসের এই হল সারকথা।

কিন্তু 'প্রকৃতি' আর 'সংস্কৃতি'—এই দ্বৈততা যদি স্বীকার না করি ? অথবা এই দ্বৈততা সত্ত্বেও যদি দেখি একটা আরেকটার উত্তরসূরী নয়, পরস্পরকে বরং জড়িয়ে আছে ? মধু থেকে মানুষ তামাকে যায়নি, মধু আর তামাক একসঙ্গেই রয়ে গেছে মানবজীবনে—যদি বরং এমন ভাবা যায় যে আচারের রাজনীতিই হল এই দ্বৈততার অবসান ঘটানো, তবে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে এমন অতি সরল ধারণার সুযোগ কোথায় থাকে ?

চিলকিগড়ের ছো-এর প্রসঙ্গে সেইজন্য আরও কিছু বলার দরকার রয়ে গেছে।
ছো-এর নৃত্যরূপ সংস্কৃত। ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক দেবদেবী প্রকৃতির উপর জয় ঘোষণা করছে। পালাগুলোর কথকতায় জনজীবনের নানা দিকে প্রকৃতিবেশী হিংস্র পশু, দৈত্য ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃতির এই জয়ের পরও প্রকৃতি ফিরে আসছে!
ছো নাচের আসরে মুখোশ নাচের সঙ্গে চলতে থাকে পাইক আর চাঙ নাচ। দেহচর্চা আর শক্তিপ্রদর্শনী হতে থাকে যুদ্ধনৃত্যের মধ্যে। আর মাঝে মাঝে চাঙ নাচ আসে, যেখানে নাচের সঙ্গে বাজতে থাকে চাঙ বাদ্যযন্ত্র। যুবক মেয়ে সেজে ঘোমটা দিয়ে বাঁকি শিল্পীর সঙ্গে নাচে। বীরেশ্বরবাবুর সংগ্রহ থেকে এক-আধটা সে গানের নজির দেওয়া যেতে পারে :

১

সরস্বতী উড়িরে কাঁসাই নদীর কূলে,
ঝল করি বিজলী মারে,
বাঁকা শ্যামের তরে,
পানিকে যাবার বেলে।
ঝরণে পানিলো নানা ঝির ঝির বাঁহলা,
চেকা কাঠি বাঁধো দিনি তবু না রহিলা,
নানা ঝির ঝির বহিলা।

২

রাত্র ক'টি পুহাইল,
উদয় হেলা রে ভানু
রাধা ঘরে চোর লো পশিল
জাগরে সোহাগিয়া।
জানিলে সে জানান্ত রাধিকা
জানিলে সে জানান্ত ধূতিকা
তোদরে সজাতিয়া,
টানি ঝিঁকি বাঁধলো বেণী,
বাপবাড়ি যিবা বলি,
কাঁহে ছিল সান দেয়রা,
হস্তে ধরি কাঁদুছি,
কাঁহে ছিল যান ননদা,
হস্তে ধরি কাঁদুছি।

পাছে পাঠকেরা ভাবেন, ছো-এর আসরে নাচ সংস্কৃতি থেকে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন নয়, আসলে সেটাও অন্য এক সংস্কৃতি, আমি শ্যামল শতপথীর সংগ্রহ থেকে আরেকটি গানের উল্লেখ করতে পারি।[৯]

ছিড়া জালে মাছ ধরে ধলভূঁয়ানি।
চূণ-দক্তায় ভুলেই রাখে চিলাকিগড়্যানি ॥
ঘরে ভাত নাই পান খায় ঝাড়গড়্যানি।
উঁচকপালি সিঁদুর পরে বেল্যাবেড়ানি ॥

ধলভূম, চিলাকিগড়, ঝাড়গ্রাম আর বেলেবেড়া বা গোপীবল্লভপুরের প্রচলিত সংস্কৃতি আর আদবকায়দার বেশির ভাগই ফাঁকি। তাই জঙ্গলমহলের সংস্কৃত নৃত্যগীত ওখানের সমাজের শোভা পায়না। আত্মশ্লেষের এমন নজির কমই আছে। কিন্তু সংস্কৃতি থেকে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন গান বা নাচের বক্তব্যের চেয়েও আসরের আচারে অধিক পরিস্ফুট। তা হলে 'ভক্তা' বা পাঁতার রেওয়াজ কেন ?

ছো-এর অনুষ্ঠান কেন ঘোড়া নাচে শেষ হত ? রঙ্কিনী কি ঘোড়ায় চড়ে ? রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ যেখানে ছো নাচ হত, সেখানে শিবের মন্দিরে গাজনের অন্য আচারটি সম্পূর্ণ হয়। শিবের সন্ন্যাসী যাঁরা হন, তাঁদের 'ভক্তা' বা 'পাঁতা' বলা হয়। একথা আগেই উল্লেখ করেছি। বীরেশ্বরবাবু দেখেছেন, গাজনের রাতে চিলাকিগড়ে যখন ঢাক সানাই বাজছে, রঙ্কিনীর 'পাঁতা' সেই অন্ধকার রাতে শালবন আর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক হাতে তলোয়ার আর মাথায় একটা ডালা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সেই ডালায় মানুষের তৈরি নরমুণ্ড। মনে হচ্ছে, রঙ্কিনীর থানে তার ভক্তা চলেছে। অর্থাৎ রঙ্কিনী নিজে। একটা বড় গাছের তলায় রঙ্কিনীর থান। গ্রামদেবীর পুজোর জায়গা। দুজন মশালধারী সঙ্গে। পুজারী ব্রাহ্মণও ছিলেন। ঢাক, ঢোল, সানাই, পতাকা নিয়ে গ্রামবাসীরাও পিছু পিছু গেছে। ব্রাহ্মণের পুজো সারা হল। মাটির মুণ্ড গাছতলায় রেখে দেওয়া হল। আরেকটা মুণ্ড নিয়ে এবার কালিকা থানের দিকে ভক্তা চলল। কালিকা থান জঙ্গলের ভেতরে। গ্রামের আচার, একমাত্র যিনি ভক্তা, তিনিই একা অন্ধকারে দেবীর থানে গিয়ে মুণ্ডটি রেখে আসবেন।

প্রশ্ন হল : শিব, গাজন, রঙ্কিনী, ছো, পাঁতা প্রথা আর চাঙ—কোন সূত্রে জামবনিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে ? আমি অন্য এক উপলক্ষে জঙ্গলমহলের কাল্পনিক বংশগাথার আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়েছি, রঙ্কিনী থেকে কনকদুর্গায় মাতৃদেবীর আরাধনার অগ্রগতি ওই অঞ্চলে কীভাবে সংস্কৃতায়নের এক সাংকেতিক বার্তা বহন করেছে। কিন্তু আমার পূর্বের সেই বক্তব্যের কিছু সংশোধন করে বলতে চাই, রঙ্কিনী মরেনি। রঙ্কিনীর থান গ্রামদেবীর পুজোর জায়গা। আবার এও লক্ষণীয়, গ্রাম দেবতা বা গরাম দেবীর থান, যা হল পুজা প্রাঙ্গণ, তাকে ঘিরে উড়িষ্যার সুরে চাঙ (বাদ্যযন্ত্র) হাতে ছেলেরা নাচত। জামবনির সংস্কৃতির এ এক মৌলিক দিক। কনকদুর্গা মেরেছে রঙ্কিনীকে সামনে দিয়ে—ক্ষমতার প্রক্রিয়ায়, রাজবাড়ির আরাধ্য মাতৃ-দেবীরূপে যে মর্যাদা প্রাপ্য, সেই মর্যাদার বলয়ে। কিন্তু রঙ্কিনী মরেনি। রঙ্কিনী ফেরত এসেছে, না কি বলব কখনও যায়নি। রয়ে গেছে, প্রকৃতি / সংস্কৃতির প্রবহমান যুদ্ধে, প্রজা / রাজার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, টানাপোড়েনে, অন্তর্ভুক্তিতে।

অন্যভাবে বলা যায়, ছো-এর আসরে সতীপালা শুধু করুণরসের সংকেত নয়, এক শাক্ত রূপেরও ইঙ্গিত। ঋতুচক্রের আবর্তনান্তে দেবীর হাতে শুধু প্রেমিক / পুরুষ / রাজা নিধন হয়না, দেবী নিজেও মরেন। শস্যপ্রাণ বা শস্যদেবতার পায়ে নিজেকে সঁপে দেয় রঙ্কিনী। ভৈরবের সঙ্গে যুক্ত হয় অমর বন্ধনে। মানবী পূজারিণী, পূজারিণী সংশ্লিষ্ট ধর্মাচার, বৎসান্তে পুরুষনিধন, স্বেচ্ছামৃত্যু স্বীকারের মাধ্যমে ভৈরবের সঙ্গে অক্ষয় মিলন, ব্রতচারণের অধিকার—এই সবের তাৎপর্য আরও হৃদয়ঙ্গম করা যায় শিলদার 'ভৈরবরঙ্কিনী মাহাত্ম্য' পড়লে। রঙ্কিনী, কালী, সতী আর শিবের বন্দনা শেষ হয়েছে ছো-এর অনুষ্ঠানে ঘোড়া নাচে। শস্যের জন্মমৃত্যু, ঋতুচক্র, অশ্বমেধযজ্ঞ—এই সম্পর্ক নৃতত্ত্ব, ইতিহাসের সাক্ষ্য, প্রত্নতত্ত্ব, তিন দিক থেকেই জামবনিতে পেয়েছি।

আরেকটা দিক লক্ষ করুন। আমি এই ইঙ্গিত দিয়েছি, চিলকিগড়ের ছো সংস্কৃত ও লোকায়ত—দুই আচারের মিশ্রিত রূপ। শাসক ও শাসিত—দুই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্র। এবং এই প্রক্রিয়া ও রসমঞ্চ সম্ভব হতো না, যদি না বাস্তবে জঙ্গলমহলের সমাজে এক মধ্যবর্তী ক্ষেত্র থাকত—ভূমিজ, মাঝি, মাহাত, মণ্ডলরা যার প্রতিনিধি সাঁওতাল, মুণ্ডা, এদের নাচে নারীদের অংশগ্রহণ থাকে—সবাই জানেন। চিলকিগড়ের ছো-এ এরা কখনও নাচত না। ওই ছো-এ নারীদের অংশগ্রহণও ছিল না। কিন্তু নারীর সাজে পুরুষেরা নাচত। কেন?

সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন উর্বরাশক্তির পূজা রিচুয়াল নৃত্য—এই সবের ক্ষেত্রে নারীর পোশাকে পুরুষের আবির্ভাব দেখলে বোঝা যায়, আদিতে নর্তকীরাই নাচত। মিতাক্ষরা/দায়ভাগের কাহিনী যাঁরা জানেন তাঁরা হলফ করতে পারবেন, নারী সম্পত্তি থেকে কীভাবে সরে এসেছে। জামবনিতে নারীকে ছলে বলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ধবলদেবের রাজবাড়ির সেই অন্তর্কলহ নিয়ে প্রায় একশ বছর আগে জামবনির সমাজে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। পরিণামে সংঘর্ষও হয়। প্রকাশ্যতা থেকে অন্দরমহলে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া, বাইর থেকে ঘরে—এ কাজটি শুধু গাঙ্গেয় বাংলা বা কলকাতাতেই সম্পন্ন হয়নি, জঙ্গলমহলেও এ চেষ্টা চলেছিল। সুরজিৎ সিংহ বরাভূম নিয়ে আলোচনাকালে দেখিয়েছিলেন, মাহাত-ভূমিজদের মধ্যে 'সভ্য' 'ভদ্র' হওয়ার চেষ্টার প্রথম প্রকোপ পড়ে নারীদের ওপর। আমি বন্ধু পশুপতি মাহাতর কাছে আজ থেকে সত্তর বছর আগে চেমাইজুড়িতে সাঁওতাল সমাজে ওইরকম এক হিন্দু হবার ঘোষণাপত্র দেখেছি—প্রায় দু'শ সাঁওতাল প্রধানের সই করা। সেখানেও প্রথম কথা সাঁওতালনিদের 'সভ্য' 'ভদ্র' হতে হবে। জামাকাপড় পরতে হবে। মদ্যপান চলবে না ইত্যাদি। মালদার জিতু সাঁওতালও চেয়েছিলেন। হিন্দু হতে। তানাভগত আন্দোলনেরও একটা দিক ছিল সনাতন ধর্মের মণ্ডলে আসা। কাজেই এ সবই যদিও অনেকটাই অনুমান হয়ত নারীর সামাজিক পালা অনুষ্ঠানে নারীর প্রকাশ্য অংশগ্রহণও বন্ধ হয়েছে।[১০] তা ছাড়া গোড়ায় দেবীর হাতে পুরুষ নিধন হলেও শেষে পুরুষ জয় করেছে দেবীকে—এও সত্য।

চারু সান্যাল জলপাইগুড়ি শহরের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে করলার জঙ্গলে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি মানুষের মূর্তি বলি দেওয়ার কথা লিখেছেন।[১১] ডালটন লিখেছিলেন সেযুগে ধলভূমে রক্ষিকনীর মন্দিরে নরবলির কথা। বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন মেদিনীপুরের অন্যান্য মন্দিরের কথা ওই একই প্রসঙ্গে।

আমি প্রকৃতি / সংস্কৃতি দ্বৈততার তত্ত্ব স্বীকার করিনা। ছো-এর প্রসঙ্গে এই সব আচারের উল্লেখ করেছিলাম সংস্কৃতি থেকে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলতে নয় বরং দেখাতে এই দ্বৈততা নেই। যা আছে, তা হল লোকসংস্কৃতির সংস্কৃত রূপ এবং ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির লোকায়ত রূপ। সংস্কৃতির জগতে আচারের বৈভব এতটাই। আচারের রাজনীতি এতটাই শক্তিশালী।

৪

কিন্তু ঋতুচক্র বা শস্যচক্রের আবর্তনের দিক দিয়ে চৈত্র-বৈশাখের আগে পৌষ। মকর নতুন ফসল টুসু—এই সব। জঙ্গলমহলের অন্যান্য অঞ্চলের মতো জামবনিতেও টুসু খুব জনপ্রিয় পরব। জমিদারবাড়ির মহিলাদের স্মৃতিচারণে লক্ষ করেছি টুসু নিয়ে অনেক স্মৃতিরোমন্থন। টুসু মেয়েদের ব্রত—এই ব্রততে কোথাও থাকে সরা ধান কোথাও টুসুর ছোট মূর্তি। জামবনির মেয়েরা নানা আলাপে বারংবার এই ধর্মাচারের কথা বলেছে, এই আচারকে ঘিরে তাদের 'ঘরে বাইরে' অনেক সময় একাকার হয়ে গেছে। টুসু পরবে মাটির সরা ভুলুং-এর জলে ভাসে। 'সসার গার্ডেন' বা কৃত্রিম শস্যক্ষেত্র তৈরি করার মধ্যে নৃতত্ত্ববিদরা হয়ত যাদুক্রিয়া বা 'রিচুয়াল ম্যাজিক' দেখবেন। কিন্তু এই প্রজনন শক্তিভিত্তিক যাদুবিশ্বাসের থেকেও চোখে পড়ে, জঙ্গলমহলের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকগুলি—চাষ উদ্বৃত্ত, উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা, জঙ্গল, গোষ্ঠিপ্রথা, জমিদার-বাড়ির প্রভাব আর কৃষক / ভূস্বামীর পরস্পর নির্ভরশীলতা।

কোশাম্বি দেখিয়েছেন, লাঙলকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে যে সব অঞ্চল পরে এসেছে, মাতৃ-প্রধান আচার বা প্রতিষ্ঠানগুলি সেখানে অনেকদিন টিকে গেছে।[১২] জঙ্গলমহলের অনেক স্থানেই জঙ্গল কেটে বা পতিত জমি উদ্ধার করে চাষবাস শুরু হয়েছে মাত্র দুশ-আড়াইশ বছর আগে। বসতি স্থাপন, জমি উদ্ধার, চাষবাস; মণ্ডলিপ্রথা, কৃষকের সঙ্গে অলিখিত এক সামাজিক চুক্তি বলে জমিদার বা রাজার এক সমাজরক্ষক বা কর্তারূপে আবির্ভাব—জঙ্গলমহলের সে কাহিনী বিশাল। অন্য সময় বলব। টুসু প্রসঙ্গে জামবনিতে দেখা যাবে লোকাচারের রাজনৈতিক শক্তি। এখন সেই প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

চিলকিগড়ে টুসু আর ভাদুগান একাকার হয়ে গেছে। জমিদারবাড়ির বয়স্ক মহিলা এবং অন্যান্য প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সে যুগে ছো-এর পরই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উৎসব হত টুসু। জঙ্গলমহলের এলাকাগত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে টুসুগানে মানভূমের প্রভাব লক্ষ করলে। ন' মহলের মধ্যে আদান প্রদান তো ছিলই।

এছাড়া পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার বহু নরনারী দিনমজুর অথবা ধলভূমের খাদানে আসত কাজ করতে। কাজেই লোকসংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটা বিচিত্র নয়। তাই মানভূমের নানা অঞ্চল যেমন কাশীপুর, বলরামপুর, বাঘমুণ্ডি—এই সব অঞ্চলের টুসুগানের প্রভাব জঙ্গলমহলের অন্যত্রও পড়েছিল। সুর, গান প্রায় এক। শ্যামলকান্তি শতপথীর সংগ্রহ থেকে এক-আধটা উদাহরণ দিতে পারি :

১

প্রণাম মাগো টুসু দেবী,
মোদের আর কত কাঁদাবি।
বছরে পৌষ মাসেতে তোমার গান করি,
করজোড়ে বন্দি চরণ, কাঁদি চরণ ধরি ॥

টুসু মানুষের আপনজন, বিশেষত মেয়েদের। যে অঞ্চলে গ্রামপত্তনের ইতিহাস দু'শ বছরের বেশি নয়, অবাক কী, সেখানে ইংরেজ আমলে জনসাধারণের একান্তও বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হবে এমন এক 'সসার গার্ডেন'কে কেন্দ্র করে, মেলা হাট পার্বণ সঙ্গীত উৎসব গড়ে তুলে। অন্যত্র এ নিয়ে লিখেছি, কিন্তু বেশি লেখারই বা কী দরকার, এ গানটা শুনুন। এটিও বীরেশ্বরবাবুর আর শ্যামলবাবুর টুসু সঙ্গীত সংগ্রহ থেকে শোনাচ্ছি। চিলকিগড়ের টুসু। কিন্তু বলে না দিলে ধলভূম বা মানবাজারের মনে হতে পারত :

২

চল সজনী টাটানগরে,
তোকে রাখব ভাড়া ঘর করে।
আনন্দেতে থাকব মোরা
ইলেকটারি আলোতে,
দুইজনাই বেড়াব মোরা
ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে,
চেক্ শাড়ি ঝুলন সায়া,
কিনবো লো বেশী দরে,
চেক শাড়িটি আয়না দেখে
পরাব লো কুঁচি করে।
মকর কাটাব মোরা,
আমরা দুইজন গান করে,
সকালবেলা সবে মিলে যাব গো
ধনী বুড়ির ঘাটে,
চিঁড়া, মুড়ি, ডিম, পাঁঠা খাব মোরা
ঘরে ফিরে।

চিলকিগড়ের একাধিক টুসু গানে পরকুলের মেলার উল্লেখ আছে। পরকুল বাঁকুড়া জেলায়! অশোক মিত্র মশাই সম্পাদিত **পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজাপার্বণ** গ্রন্থে জঙ্গলমহল অঞ্চলের যে সব মেলার উল্লেখ আছে, তাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নিয়ে আরও গবেষণা হলে দেখা যাবে, এই সব কার্নিভালে খালি আপামর জনসাধারণের মেলামেশাই সে যুগে সম্ভব হয়নি, এক সাধারণ সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে। যার প্রধান বিষয় হল জঙ্গল কেটে বসত গড়া এই সব গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের আকাঙ্ক্ষা, আর্তি। ধান না উঠলে সমবেত আচার হবে না, সমবেত আচার সম্ভব হলে তবেই শিবের আবাহন চৈত্র-বৈশাখে। টুসুতে রাজপ্রাসাদ বা রাজপৃষ্ঠপোষকতা নেই। সমষ্টি সদ্য তখন রূপ নিচ্ছে। শাস্ত্রীয় কৌলিন্য আসছে পরের ঋতুতে। আমি উল্লেখ করেছি, গাজনের সময় করুণরসের উদ্রেক হচ্ছে, 'ছো-তে' 'রঙ্কিনী পাঁতার' মাধ্যমে একই সঙ্গে রঙ্কিনীর শক্তিকেও স্মরণ করা হচ্ছে। টুসু মেয়ে। একা ছাড়তে ভয় হতে পারে। তাই তাকে ছেলে সাজতে হতে পারে কখনও কখনও। হাতে টাঙি থাকবে। এ যেন রঙ্কিনীরই অন্য এক রূপ। জঙ্গলমহলের মেয়েরা গোটা ঔপনিবেশিক যুগ ধরে (শুধু সে যুগে কেন, আজও) নানাভাবে যেরকম বহির্জগতে নেমেছে, তাতে টুসু আর রঙ্কিনী —এই দেবীরা যে ভালবাসার পাত্র হবেন, শক্তি জোগাবেন, তাতে আশ্চর্য কি! প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে টুসুর মতো ভাদু গানও চিলকিগড়ে জনপ্রিয় হয়েছিল পুরুলিয়া বাঁকুড়া থেকে। ভাদ্রমাসে কুমারী মেয়েদের উৎসব ভাদু। চিলকিগড়ের নিম্নোক্ত গানে ধলভূমের খনির উল্লেখ পাওয়া যায় :

মুশাবনি মুশাবনি হাটের বড় নাম শুনি
বড়বাবু চাল জুড়োনি,
ছোটবাবু লাপানি,
চল চল গাড়িতে,
টাকায় সিকি লাভ আছে,
হবে কথা কানের কাছে।

টুসু আর ভাদু যেভাবে সে যুগ থেকে এই অঞ্চলে জনপ্রিয় হল, ঋতুচক্রের আবর্তনকে কেন্দ্র করে নানা মেলা গড়ে উঠল, টাটানগর মুশাবনি, রাঁচি, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া —এই সব শহরকে ঘিরে গান তৈরি হল, তাতে বলা যায় জনসমাবেশ, সমবেত আচার-অনুষ্ঠান আর নানা সম্প্রদায়, নানা বসতি, নানা গ্রামকে মিলিয়ে এক সার্বিকতার গোড়াপত্তন সম্ভব হল। এ না হলে ১৯২৩-এর ব্যাপক জনসমাবেশ, বিক্ষোভ সম্ভব হতো না। তার আগে কৃষকরা জামবনিতে সামন্ততন্ত্র এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শুধুই মামলা মোকদ্দমা করেছে। কিন্তু সাঁওতাল পরগনার কৃষক বিদ্রোহের স্মৃতি, রাঁচির কৃষক বিদ্রোহের প্রভাব, শিলদায় সুবর্ণমনির বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হল এই সব মেলার সমবেত ঐতিহ্য আর কার্নিভাল উপলক্ষে নিয়মিত প্রতিবছর নানা মানবীয় মূল্যবোধের রোমন্থন। ভাদু, টুসু, গাজন, ঝুমুর, কাঠি, পাতা—

এ সবের সাংস্কৃতিক অন্তর্বস্তু তো রয়েছেই ; লক্ষণীয় হল এই সব আচার অনুষ্ঠান জনমানসে তৈরি করত একধরনের 'হৃত সমৃদ্ধি আর বর্তমান দারিদ্রবোধের'। সৃষ্টি হতো সেই প্রক্রিয়া যাকে বলা যেতে পারে 'নৈতিক শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থার বিপর্যয়।'

শ্যামলকান্তি শতপথী জামবনির লোক। তার সংগ্রহ থেকে কিছু গানের উল্লেখ করেছি। জামবনিতে প্রচলিত লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের আলোচনাক্রমে তিনি কাঠি, পাইক এবং সাঁওতাল নাচেরও উল্লেখ করেছেন। কাঠি নাচেও কয়েকজন ছেলে মেয়ে সাজে। রামায়ণের নানা কাহিনী নিয়ে এই নাচে মূলত অংশগ্রহণ করত মহাদণ্ড, দণ্ডছত্র মাঝিরা। পাঁতা নাচে মাদলের বাজনার সঙ্গে তালে পা ফেলে গোল হয়ে যে নাচ আর গান হতো, তাতে কখনও কখনও ঝুমুরও মিশে যেত। রদারমান্ড উল্লেখ করেছেন 'এনক্লেভ ইকনমি'র কথা।[১৪] বদ্ধ অর্থনীতি বলা হতো, কারণ গোটা জঙ্গলমহলের মানুষ থাকত জমিদার, ব্যবসাদার আর কুলি চালানদারদের কাছে বাঁধা। দারিদ্র, ক্রমাগত জমি থেকে উচ্ছেদ, দুর্ভিক্ষ যার উল্লেখ হান্টার, তার **স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট**-এ করেছিলেন ১৮৭৬-এ।[১৫] ক্রমবর্ধমান খাজনা এসবের-হাত থেকে সাঁওতাল, ভূমিজ, মাঝিরা পালাতে চাইত। পালাতে গিয়ে খপ্পরে পড়ত কুলি চালানদারদের। 'হৃত সমৃদ্ধি ও বর্তমান দারিদ্র বা নিঃস্ব দশা'র এই মানসিকতা যত না ইতিহাসচর্চা দিয়ে বোঝা যাবে, তার থেকে বেশি বোঝা যায় লোকমানসিকতাকে বোঝার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। ইতিহাস আর এথনোগ্রাফি নিয়ে তর্ক এখানে অবান্তর। এই অসাধারণ গানটি শুনুন। এটা নাচা হত পাঁতা নাচে।

আসাম যাব চাকরি পাব, জোড়াপাখা টানাইব,
সাহেব দেখে উড়িল পরাণ হে বাঁকা শ্যাম,
ফাঁকি দিয়ে পালালে আসাম।

জামবনির পাশের থানা ঝাড়গ্রাম। ১৯২৫-এর আগে জামবনি ঝাড়গ্রাম একই থানার অধীন ছিল। ঝাড়গ্রামের পটুয়াদের গান জামবনির গ্রামে গ্রামে গীত হতো। সাঁওতাল গ্রামে সাঁওতালি পট, যমপট, বৈষ্ণবপ্রধান গ্রামে রাধাকৃষ্ণ পালা-এসব ছাড়াও স্বদেশী গানও পটুয়ারা গেয়েছে। ঝাড়গ্রামের নামকরা পটুয়া পবন চিত্রকরের উল্লেখ বীরেশ্বরবাবু করেছেন। স্বদেশীযুগে পুলিশ তাঁকে ধরে, কারণ ক্ষুদিরাম, গান্ধীজী—এঁদের কথা পবন পটে আঁকতেন, গাইতেন—এমনকি সাঁওতাল বিদ্রোহের কথাও। চুয়াড় বিদ্রোহও বাদ যায়নি পবন আর তার পুত্র ভগীরথ পটুয়ার বিষয়াদি থেকে। বীরেশ্বরবাবুর দুটি সংগ্রহের পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে।

১

গ্রামে মহাজনে সুদে বাড়ায় টাকা,
কলসি ভরা টাকা খড় মাটি ঢাকা।
লুটে লয় থালা বাটি কাড়ে ঘর দোর,
দারোগার মদত পেয়ে বাড়ে যত জোর।

মাটি কাটিয়ে মহাজনে ছাড়ে না কড়ি,
চাইলে চাল তারা বাঁধত জোর করি।
বড় দুখ দিত সব হারামজাদা যত
মেয়েদের রেখে দিত কাঁদত তারা কত।
অনেক দুখে সাঁওতাল যত করেছিল পণ,
করবে লড়াই ধরবে টাঙ্গি আছে যত জন।
সাঁওতাল মেয়ে সেজে ছেলে ধরেছিল তীর,
তাদের কথা বই লিখা হয়না তারা কত বীর।
সিধু কানু প্রাণ দিল গ্রামের সবাই কাঁদে,
আজও আমরা পড়ি মহাজনের ফাঁদে ॥

২

এই মাটির চুয়াড় গোঁয়ার বীর,
তারা ধরিল টাঙ্গি ধনুক তীর।
রক্ত দিয়েছিল বুক পেতে তারা,
মানেনি ইংরাজের নূতন ধারা
সে দিনের যত ভদ্রবাবু উঁচু জাত,
তারাই কাড়ত মোদের পেটের ভাত।
কোম্পানীর হয়ে দালালী করত তারা,
কত মরেছিল চুয়াড়—বীর যারা ॥

এই আচার ও পর্বগুলোর রাজনৈতিক সম্ভাবনা বোঝা যায় ভাদু এবং টুসু গানের রাজনৈতিক ব্যবহার লক্ষ করলে। প্রসঙ্গত, এটাও লক্ষ করার মতো, যেমন দেশকে দেশমাতৃকা ভেবে, তাকে দেবীবন্দনা করে স্বদেশী আন্দোলন একসময় জোর পেয়েছিল, তেমনই টুসু, ভাদু—এই সব লোকায়তকন্যা বা দেবীর বন্দনা গেয়ে জঙ্গলমহলে লোকায়ত আন্দোলন গতি পেয়েছে। অনুমান হয়, দেশমাতৃকারূপে স্বদেশী বন্দনা লোকায়ত এই আচারেরই সংস্কৃত বা শাস্ত্রীয় রূপ। এখনও যাঁরা সেযুগের জঙ্গলমহল, যা আজকের যুগে বেশির ভাগই ঝাড়খণ্ড অঞ্চল—এই এলাকার রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর রাখেন, তাঁরা জানবেন ঝুমুর, টুসু, ভাদু—লোকায়ত সংস্কৃতির নানান ধরন আর আচার কীভাবে 'ঝাড়খন্ডি' সংস্কৃতি ও পরিচিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। জাতি গড়ে ওঠার ইতিহাসে সংস্কৃতির সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা প্রসঙ্গে এ প্রায় এক অকাট্য নজির। নারী শক্তি দেবে, ভক্তি জাগাবে, প্রেম জোগাবে, প্রেম জাগাবে, ভয়ের সঞ্চার করবে, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মাঝে ঐক্য বা সংহতিবোধ আনবে, সম্প্রদায় বা সমাজের আন্দোলনে এ প্রায় আর্কিটাইপাল বা আদি মানসিকতা। ভাদুর গান গাইত এবং এখনও গায় বাগদি, বাউরিরা। ভাদুমূর্তির চারপাশে সমবেত মেয়েদের নাচগানের উৎস ওইরকমই এক সমবেত মানসিকতা থেকে। ভাদু

রাজার মেয়ে। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর প্রচুর দরদ ছিল। গরিব দুঃখী ছিল তাঁর আপনজন। সাধারণ গ্রামবাসীর চিন্তায় রত এই ভাদুর মৃত্যু হয়েছিল তাঁর বিয়ের আগে। মানভূমের কাশীপুরের রাজকন্যা কি এই ভাদু? কোনও সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। যাইহোক, মানভূমের কিংবদন্তী অনুসারে কাশীপুরের রাজকন্যার মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পিতা কন্যার মাটির মূর্তি গড়িয়ে স্মরণোৎসবের আয়োজন করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় দেবীরূপে কল্পনা করে তাঁর মূর্তি গড়ে ভাদ্রমাসে উৎসবের দিনে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই একই বৈশিষ্ট্যগুলি এখানেও লক্ষণীয় : নারীকে কেন্দ্র করে সমবেত আচার, প্রজাদরদীর প্রতি কৃষক জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে ভূস্বামী-কৃষক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রকাশ, পৌরাণিক দেবদেবীকে পুজো করার পরিবর্তে স্থানীয় কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র মারা যাবার পর তাঁর স্মৃতিকেই দেবগরিমায় ভূষিত করা এবং এই আচারাদির সঙ্গে শস্যচক্রের গভীর সম্পর্ক। আউস ধান কাটার আগে ভাদ্রমাসে পুজো করতে হবে।[১৬] পরিশেষে, এই বৈশিষ্ট্যও লক্ষ রাখার মতো যে, সমগ্র জঙ্গলমহল বা ন'মহল জুড়েই এই আচারাদি আছে। তাই মানভূম থেকে ভাদুর প্রভাব ধলভূম-জামবনি-ঝাড়গ্রাম পৌঁছতে সময় লাগেনি। মানভূমে অবশ্য টুসু এবং ভাদুর রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছিল প্রত্যক্ষ। শুধু আধুনিক জনসমাবেশের ধারা সৃষ্টিতে এই পর্ব ও আচারগুলি উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করেনি, আধুনিক গণআন্দোলনেও টুসু ও ভাদু গান ব্যবহৃত হতে থাকে। বীরেশ্বরবাবু পুরুলিয়ার রাঘবপুর গ্রামের কবি ঘাসিরাম মাহাতর রচিত স্বদেশীযুগের ভাদুগানের উল্লেখ করছেন :

১

উড়ছে নিশান, বাজিছে বিষাণ,
বিদেশী রাজত্বের আর প্রয়োজন নাই,
হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই,
থাকবেনা রাজা, হবো সকলে প্রজা,
থাকবেনা দুখের লেশ,
(ও ভাই) আমরা গড়বো সব সমানে দেশ।

দেবেন মাহাতর স্মৃতিকথার উল্লেখ করে মানভূমে স্বাধীনতা সংগ্রামে মাহাত জাগরণের যে তথ্যাদি পশুপতি মাহাত হাজির করেছেন, তাতে এই জনপ্রিয় আচারগুলি যে কার্যকর ভূমিকা নেয় সন্দেহ নেই। স্বদেশীযুগে ভাদু গানের এই রাজনৈতিক সম্ভাবনা ভাদু গানের ভাষাতেই প্রকাশ করা যায় :

২

ভাদুর গান গাইতে দেয়না গো,
বাধা দেয় ভাদুর গানে

জয়ঢাক বাজিয়ে দিলে,
থানার যত পুলিশগণে ॥
স্বাধীনতার গান গাইছে বলে গো,
ডাকলে অহিভূষণে।
বলে তুমি ভাদুর গানে,
এ সব প্রচার করছো কেনে ॥
সিন্দুর দিলে সাজে ভালো গো,
ভাদুর দুটি চরণে।
বাংলা দেশে আর কতদিন,
থাকবো ভাদু পরাধীনে।

এই গানের অহিভূষণ ছিলেন বীরভূমের দাশকল গ্রামের অহিভূষণ মন্ডল। স্বদেশী-যুগে ভাদু উৎসবের লোকপ্রিয়তার রাজনৈতিক ব্যবহারের নজির বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়াতে পাওয়া গেছে। জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির এক অসাধারণ নিদর্শন রয়ে গেছে এই ভাদু গানে। স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠান, 'প্রজাবৎসল' ভূস্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, স্বদেশী সমাবেশ—এই সমস্ত দিক থেকেই ভাদুর উল্লেখ করতে হয় জঙ্গলমহল আর বিশেষ করে এখানে জামবনির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে। ভাদুর প্রসঙ্গে টুসুর কথা আগেই বলেছি। এই বছরের গোড়ায় পুরুলিয়ায় অশীতিপর বৃদ্ধা মোহিনী দেবী (মাহাত)-র সঙ্গে দেখা করেছিলাম। স্বদেশীযুগে টুসুর ব্যবহারের কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রখ্যাত নেত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবী, যিনি এই ৯৩ বছর বয়সে এখনও সক্রিয়, তাঁর পুত্র এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী অরুণ ঘোষ আমায় পঞ্চাশের দশকে পুরুলিয়ায় বঙ্গসংস্কৃতি আন্দোলনে টুসু গানের এক সংকলন উপহার দিয়েছেন। ন'মহলের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পঞ্চাশের দশকেও বেঁচে ছিল। লোকসেবক সঙ্ঘের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্য হয়ত শুকিয়ে গেছে। জানিনা, আজকের ঝাড়খণ্ড সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে জঙ্গলমহলের সেই ঐতিহ্য পুনর্জন্ম পেয়েছে কিনা!
যাইহোক, অরুণবাবুর সংকলন থেকে একটা-দুটো নিদর্শন দিচ্ছি।[১৭]

১

আমার মনের মাধুরী
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি।
আকাশ জুড়ে বিষ্টি নামে
মেঠো সুরের কোন চুয়া
বাংলা গানের ছড়া কেটে
আষাঢ় মাসের ধান রুয়া ॥
মনসা গীতি বাংলা গানে
শ্রাবণে জাত-মঙ্গলে

চাঁদ বেহুলার কাহিনী গাই
চোখের জলে গান বলে ॥
বাংলা গানে করলো সই
ভাদু পরব ভাদরে
গরবিনীর দোলা সাজাই
ফুলে পাতায় আদরে ॥
বাংলা গানে টুসু আমার
মকর দিন সাঁকরাতে
টুসু ভাসান পরব টাড়ে
টুসুর গানে মন মাতে ॥

মানভূমের বাঁশাবুরুর মধুসূদন মাহাত আরেকটা এমনই গান রচনা করেছিলেন।

২

ধুয়া : মন মানে না হিন্দিরে সইতে
ভাষা মোদের হরে নিল হিন্দিতে ॥
মাতৃভাষা হরে যদি
আর কি মোদের থাকে রে।
(তাই) মধু বলে মাতৃভাষার
ধ্বজা হবে বহিতে ॥

পুরুলিয়ার কাঁঠাডির শিক্ষা সত্র ইস্কুলের মাস্টারমশাই চন্দ্রমোহন মাহাতর সঙ্গে জঙ্গলমহলের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা নিয়ে কথা বলেছি। শিক্ষা সত্র ইস্কুলের সামনে একটা বিশাল শাল গাছ আছে। বেদী বাঁধানো। আমাকে চন্দ্রমোহনবাবু জানিয়েছিলেন, ওই বেদীতে বসে আশুতোষ ভট্টাচার্য মানভূম, ধলভূম, বরাহভূম, সিংভূম ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন চন্দ্রমোহনবাবু ও উপস্থিত অন্যান্যদের। তারপর খেদে মন্তব্য করেছিলেন চন্দ্রমোহনবাবু, আশুবাবু তাঁর লোকসাহিত্য গবেষণান্তে এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেননি। তার চেয়েও বড় কথা, আশুবাবু এটাই বোঝেননি, করম, ঝুমুর, ছো, ভাদু, টুসু, পাইক ইত্যাদি গান আর নাচ শুধু লোকায়ত শিল্প-সংস্কৃতির নজির নয়, এটা একটা পৃথক জাতিসত্তার পরিচিতির ইঙ্গিতবাহী। পশুপতি মাহাত হয়ত আরেকটু এগিয়ে বলবেন, এটা একটা স্বতন্ত্রসভ্যতা—মিলনধর্মে বিশিষ্ট, গভীরভাবে শস্যচক্রের নিয়তির সঙ্গে যুক্ত ঝাড়খণ্ড এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবোধসূচক এক 'ইকুইমেনিকাল' সভ্যতা—পশুপতির ভাষায় 'সোশ্যাল সিভিলাইজেশন' সমাজধর্মী সভ্যতা। চন্দ্রমোহনবাবু উপলব্ধির মানুষ, চিন্তাশীল ও হৃদয়বত্তায় পূর্ণ তো বটেই। ওঁর মতে, ন'মহলের সংস্কৃতিতে ভূস্বামীদের প্রভাব আছে ঠিকই, কিন্তু এই সংস্কৃতির আসল দিকটা হল ভূস্বামী প্রবর্তিত শাস্ত্রীয়করণ বা সংস্কৃতায়ন থেকে স্বতন্ত্র, বরং বলা চলে শাস্ত্রীয়করণের

অমোঘ প্রবণতার বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষা, জমিদারি ও ঔপনিবেশিক দাপটের বিরুদ্ধে স্বীয় পরিচিতি বা স্বাজাত্যবোধের রক্ষাকবচ।

চন্দ্রমোহনের সঙ্গে মাঘের শীতের ভোরে আমরা চলেছিলাম দশ কিলোমিটার দূরে সিন্ধুবালার বাড়ির দিকে। ঝাড়খন্ড বুদ্ধিজীবী মঞ্চের কারো সম্মেলনে সিন্ধুবালাকে দেখি—তাঁর গান আর নাচ। সিন্ধুবালা নাচনি। ঝুমুরের নাচনি সংস্করণেও শাস্ত্রীয়-করণ এসেছে। নাচনির ওস্তাদ লাগে, গুরু বা রসিক। সিন্ধুবালা বোকারো এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, জামবনির চিলকিগড় রাজবাড়িতে যৌবনে গেছেন, নেচেছেন। সে যুগের আলোচনাপ্রসঙ্গে জামবনির ঝুমুর গানের চলের উল্লেখ হওয়ায় ভেবেছিলাম দেখি, যদি জামবনি-ঝাড়গ্রামের তদানীন্তন ঝুমুর সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় সিন্ধুবালার কাছে। যাইহোক, সে কথায় পরে আসব।

সিন্ধুবালার গ্রাম থেকে ফেরার পথে একটা ছোট গ্রামের চায়ের দোকানের সামনে খাটে বসে চন্দ্রমোহনবাবু বলছিলেন যাওয়ার সময় কথাবার্তার রেশ ধরে, ঝাড়খণ্ডের রাজনীতি নানা সময়ের বাঁকে নানা দিকে মোড় নিয়েছে। আর এখন তো সঙ্কুল অবস্থা। মাঘের শীতেও মানভূম গরম। আজ ঝাড়খণ্ডদের 'অত্যাচারের' বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের 'বন্ধ' কাল সি পি এমের 'জুলুমবাজির' বিরুদ্ধে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার হরতাল। সুদূর প্রত্যন্ত সাঁওতাল বা মাহাত গ্রামের দেওয়ালে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার আর বামফ্রন্টের স্লোগান, ঘন ঘন টাঙি হাতে লোকেদের যাওয়া আসা। কিন্তু রাজনীতি আর রাষ্ট্রিক গোলযোগের তলায় বা তাকে উপেক্ষা করে ন'মহল, দশ মহলের সংস্কৃতি প্রহমান। এতে বিচ্ছেদ ঘটেনি। প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। বাপেরবাড়ি যাওয়ার সময় করম গাইছে মেয়েরা, পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু নামছে। 'জাগরণ' হচ্ছে। ভাদ্রমাসে চাষবাসের পর দাঁড় নাচছে ছেলেরা, মেয়েদের করমের পাশাপাশি। ভিডিও গ্রামে এসেছে ঠিকই, শাস্ত্রীয়-করণও হচ্ছে। সরহেকেলা, ময়ূরভঞ্জে তো রাজপৃষ্ঠপোষকতায় ছো-এর বিরাট সংস্কৃতায়ন ঘটে গেছে। কিন্তু মূল সাংস্কৃতিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ।

চন্দ্রমোহনবাবুর রসোপলব্ধিতে ভাল লেগেছিল, কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারেনি। তার কারণ, মুঘল যুগের শেষদিকে, জঙ্গলমহলের গোড়াপত্তনের কালে, পরবর্তী দীর্ঘ ঔপনিবেশিক সময়ে, ভূমিজ রাজাদের ক্ষত্রিয়করণ্য ভবনের প্রভাবে এই সংস্কৃতি মানবীয় রূপ গ্রহণ করেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজকের এই খরা বন্যার রাজনীতিতে, বাংলার বাঙালিভবনের দাপটের, বামফ্রন্টের সার্বিক আধিপত্যের তলায় ব্যাংক-ত্রাণ-আই আর ডি পি-উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প-সাক্ষরতা অভিযান-ঠিকেদার-আমলা-পার্টিবাবুদের যুগে সেই সাংস্কৃতিক ধারা কীভাবে অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব ? জাতীয় সংস্কৃতি বলতে আজ আমরা যা বুঝি যেমন খাদি, স্বদেশী কাপড়, নারীমর্যাদা, দলিতউন্নয়ন, শিক্ষার মূল্য, নিজস্ব ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি—অর্থাৎ এক আধিপত্যমূলক মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি যা 'জাতীয়' সংস্কৃতিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে, জাতীয় আন্দোলনের মূর্তরূপের মাঝে। ঠিক তেমনই জঙ্গলমহল/ঝাড়-

খণ্ডের জাতিসত্তার আদর্শ আর আন্দোলনের মাঝেই এই লোকায়ত সংস্কৃতি পুনর্জীবন পাবে। অন্য নিয়তিটি হল আশু ভট্টাচার্যের 'ওলড কিউরিওসিটি শপ'-এ এই আচারগুলির স্থান গ্রহণ।

সিন্ধুবালার কথায় ফিরে আসি। চন্দ্রমোহনবাবু পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত করমতীর্থ নামে একটি সাময়িক পত্রের 'সহায় বাঁধনা' উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটি (১৯৯০) হাতে দিয়েছিলেন। সিন্ধুবালার দেখা পাইনি সেবার। কোনও এক বিয়ে উপলক্ষে সিন্ধুবালা ওস্তাদ গৌর কুইরিকে নিয়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন। যাইহোক গৌর কুইরির বাড়ির অত্যুৎসাহী ছেলেরা সিন্ধুবালার পাওয়া নানা মানপত্র, নানা কাগজে প্রকাশিত তার সম্পর্কের খবর দেখায়। কাগজের কথা বাদ দিলাম। দারিদ্র, একসময়ে যৌবনের সম্ভোগ-নাচ-গান, মূল রসিক প্রয়াত মহেশ্বর, ডাকনামে চেপা মাহাত আর সিন্ধুবালার প্রণয়োপাখ্যান, সঙ্গীতনৃত্য কেন্দ্রিক সম্পর্ক, কাশীপুর রাজবাড়িতে নাচ—এই সব মিলিয়ে একটা স্টিরিওটাইপ আছে যা কাগজে থাকবেই। শুনেছি, এক প্রখ্যাত সাপ্তাহিকে নাকি টানা গল্পও লেখা হয়েছে—উপন্যাসসম। কিন্তু মানপত্র দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেওয়া মানপত্র যাতে সম্মান জানানো হয়েছে কিন্তু জ্ঞান দিতেও ভোলা হয়নি যে এই বৃদ্ধা আজীবন যেন লোকসংস্কৃতির সেবা করে যান! লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা লোকজীবন। লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি করছেন তো এঁরাই! আর 'সেবা' যদি কারুর করার থাকে, তা আমাদের সর্বোপরি মহামান্য সরকারবাহাদুরের!

যাইহোক, **করমতীর্থের** ওই সংখ্যায় সিন্ধুবালা আর ঝুমুরের বিষয়ে এক দরদী লেখা রয়েছে। লেখাটির নাম, 'মহেশ্বর ওরফে চেপা মাহাত রসিকনাগরের মধুমক্ষিরানি ঝুমুর নৃত্যকলা শিল্পী সিন্ধুবালা দেবী এবং তাঁর পথিকৃত্য কলা সংস্কৃতি ধারার গতি প্রজন্মর—পর্য্যালোচনা।' লেখক বি. সি. কৈড়য়ার। সিন্ধুবালার কথা বলছি এই জন্য যে জামবনিতেও আমি সে যুগের ঝুমুর আর ঝুমুর গায়ক-গায়িকাদের খোঁজ করে চলেছি, সামান্য আলোও দেখা দিয়েছে, সে সন্ধানে। সে কথায় পরে আসব। সিন্ধুবালার জন্ম ১৯১২-তে এ বান্দোয়ান থানার মেঘলা গ্রামে। মনসামঙ্গলের নাচনি বেহুলা সুন্দরীর কথা মনে আছে? সেই বেহুলার কায়দায় সিন্ধুবালা গ্রামে নাচতে থাকেন। বেহালাবাদক গৌর কুইরি, তবলচি দুখভঞ্জন মহান্তি, বংশীবাদক গুহিরাম মোদক, হারমোনিয়াম বাদক গোলকবিহারী রায় আর সুপ্রসিদ্ধ মাদলবাদক রসিক মহেশ্বর মাহাত-এঁদের কাছে সিন্ধুবালার শিক্ষা হয়। দরবারি, ভাদরিয়া, একঢালিয়া কীর্তনিয়া, খেমটা, দাঁড়, পাতা, ঝুমুট ইত্যাদিতে পারদর্শী সিন্ধুবালা ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সমগ্র জঙ্গলমহল।[১৮] হাজারিবাগ, ধলভূমগড়, ঝাড়গ্রাম, বারিপদা, জামবনি—ইত্যাদি স্থানে তিনি গিয়ে এবং এই সব পরগনায় আরও অনেক মহিলারাই সেযুগে সিন্ধুবালার মতো নাচতেন, গাইতেন—যাঁদের নাম আজ হারিয়ে গেছে। বাঙালি মেয়ের অন্দরমহল ছেড়ে বাইরে বেরুনো চাকরি-বাকরি শিক্ষা-শিক্ষকতা আর

নানা পারফর্মিং আর্টস ধরে—জাতীয়তাবাদের এই অভিব্যক্তি একেবারেই মধ্যশ্রেণী-কেন্দ্রিক। তার কারণ, গ্রামেগঞ্জে বাংলা, শাস্ত্রীয়, সংস্কৃত বাংলার বাইরে সীমান্ত অঞ্চলে মেয়েদের প্রকাশ্য ও গণসাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ আগেই ছিল। হয়ত, এখন কমে আসছে। এবং যে সমাজে নারীর অন্তর্জগতের ব্যথা-বেদনা, আনন্দ ও অন্যান্য অনুভূতি আধুনিক বুর্জোয়া অর্থে কখনওই 'প্রাইভেট' হয়ে থাকেনি, সমবেত আচারে সর্বদাই প্রকাশিত হয়েছে, নারী বেঁচেছে সম্প্রদায় বা সমাজের সবাইকে নিয়ে, সেখানে ঘরে / বাইরে, গোপন / প্রকাশ্য, অভ্যন্তরীণ / বহির্জাগতিক—এই ধরনে মৌলবাদী দ্বৈততা বা 'এসেনসিয়ালিজম্' অচল, পাবলিক / প্রাইভেটের চালু কিসসাকে সেখানে ত্যাগ করতে হবে। সুজাতা মাহাত 'করম গীতে ঝাড়খণ্ডী বধূর জীবনচিত্র' নামে একটি লেখায় দেখিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের নারীর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের অনুভূতি প্রকাশ্য আচারে বিধৃত।[১৯] একটা-দুটো নজির দিতে পারি :

১

কা কা করলে কাওয়া
বসলে তমাল ডালে রে
সত্যি করে কহরে কাওয়া
মাই কেমন আহো রে

২

পাণি লায়ে গেরহেঁ ঘেইলা ভাঙি গেইলগো
ওগো শ্বাশে ননদে পাড়ই গ্যাইল গো।

৩

ঝাঁটাই পেঁটাই ফেলব দুই হাতেক শাঁখা রে,
লাথি মারি খেদব রায়বাঘিনী দুই সইতিনী রে।

করম, ঝুমুর—এ শুধু গান নয়, একটা সভ্যতার বা সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।

৫

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, যে সংস্কৃতি সে যুগে এত সাঙ্গীতিক ছিল, যে সংস্কৃতি বহির্জগত অন্তর্জগতকে এত মেলাতে পেরেছিল, কৃষিউৎপাদনের সঙ্গে যার এত অচ্ছেদ্য বন্ধন, সেই সংস্কৃতির ধারায় কেন ভাঙন এল? জামবনিতে সিন্ধুবালাকে খুঁজতে কেন এত বেগ পেতে হয়? লোকসংস্কৃতির ইতিহাস খোঁজা জামবনিতে কেন এত দুরূহ মনে হয়েছে? লোকসংস্কৃতির ইতিহাস হয় না, তার নৃতত্ত্ব / জাতিতত্ত্বমূলক কাহিনী হয়—এই কি উত্তর? না কি ফ্রেজারের উত্তর, ম্যাজিকের দিন শেষ, ধর্মেরও দিন প্রায় গত, এখন দিন র‍্যাশনালিটির? না কি বলব, ভূস্বামীদের প্রবর্তিত শাস্ত্রীয়করণ এর মূলে? এর আরও এক কারণ হতে পারে। হয়ত স্মৃতিবিলোপ ঘটেছে, 'সাংস্কৃতিক নীরবতা' বা 'কালচারাল সাইলেনস'?

আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আগে বলি।

জামবনিতে জমিদারবাড়ির লোকজনকে, বিশেষত সবচেয়ে শিল্পপ্রবণ মন নির্মলেশ-বাবুকে যতবার প্রশ্ন করেছি, 'ছো', 'টুসু', 'ইঁদপুজো'—এ সবের বাইরে লোকায়ত সঙ্গীত নৃত্যের আর কি ছিল, সঠিক বা নিশ্চিত হদিস পাইনি। সাঁওতালদের সমবেত নৃত্যের কথা বাদ দিলাম, কিন্তু অন্য কোন ধরনের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে মেয়েরা অংশ নিতেন? তার উত্তরও পেয়েছি অনিশ্চিত। শিল্পের শাস্ত্রীয়করণ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা কেউ দিতে পারেননি। জমিদারবাড়ির অন্তঃপুরের মেয়েদের জবানিতে সে যুগের যে স্মৃতি, সে হল অন্দরমহলে আবদ্ধ এক অনুভূতিপ্রবণ নারীর স্মৃতিচারণ, যে স্মৃতিপটে অন্দরমহলটাই 'বাহির' হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ তো দেবী দাসীদের কথা, মেঝানদের কথা নয়।

কিন্তু হাল ছাড়িনি আমি। মানভূমের সংস্কৃতি নিয়ে অন্যান্যদের গবেষণা এবং আমার স্বীয় অভিজ্ঞতা আমার মনকে বলছিল, জঙ্গলমহলের একাংশের প্রভাব কি অন্যত্র থাকবে না? বঙ্কিম মাহাত যাকে বলছেন 'লোকভাবনা', 'ঝাড়খণ্ডের লোকভাবনা'—তার চিহ্ন ধরে এগোলে কি লোকসংস্কৃতির ইতিহাস পাওয়া যাবে না, যা শুদ্ধ নিছক ফোকলোরের এথনোগ্রাফি হবে না? এই অনুসন্ধান এখনও পূর্ণ হয়নি। তাই খাপছাড়া কয়েকটা নজির দেব।

করম, টুসু, ভাদু—এগুলো আনুষ্ঠানিক গীত। বিশেষ সময়ের, উপলক্ষের, পর্বের এবং আচারের। মেয়েদের অংশগ্রহণ এখানে বিশেষ উপলক্ষের অনুমোদন বা লেজিটিম্যাসি পেয়েছিল। জামবনির উচ্চবর্গীয়রা এগুলো মেনেও নিতেন। কিন্তু ঝুমুর হল সবসময়ের যে কোনও সমবেত আনন্দের। এগুলোয় মহিলাদের অংশগ্রহণকে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি অনুমোদন করেননি। তাই জামবনি কেন, ময়ূরভঞ্জ, ঝাড়গ্রাম, ধলভূম, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অন্যান্য অঞ্চলের ঝুমুর গায়িকারা ইতিহাসে হারিয়ে গেছে। ঝাড়খণ্ডের জাতীয় ইতিহাস লেখার রাজনৈতিক তাগিদ না বাড়া পর্যন্ত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া এই সব শিল্পীদের নাম পুনরুদ্ধার হবে বলে মনে হয় না।

খোঁজ করতে করতে জেনেছি, ঝাড়গ্রাম-জামবনিতে কুসমি নামে এক ঝুমুর গায়িকা ছিলেন। নিবাস, টেঙা গ্রাম। করমঠাকুরের পরবে কার্তিক মাসে কুসমি বেরোতেন নাচ গানে। ইঁদের সময় রাজবাড়িতে নাচনিরা আসত, খেমটি নাচ হত, এ কথা প্রথম জানতে পারিনি। শাস্ত্রীয়করণের গৌরবময় ঐতিহ্যের তলায় এ সব কথা চাপা ছিল। যাইহোক, পরে এক মজলিশি আসরে জানলাম কুসমির কথা। কুসমি রাজবাড়িতেও এসেছিল। নিমাই রায়, পূর্ণ খামরাই, দেবেন বাউরি—এরা সব বেরুত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পানুবাবুর সঙ্গে। পানু নারায়ণ দেও রাজকর্মচারী। কিন্তু রসিক লোক। দেবেনও গাইত। দেবেন পালকির বেহারা, হৃষিকেশ, প্রাণকেশ, মুক্তকেশ—তিন ভাই-ই ঝুমুরের ওস্তাদ। প্রাণকেশ বা পানুবাবুর আরেক দোসর বাবুলাল হাড়ি। সেও

রসিক। ঋষিবাবু বা হৃষিকেশ, প্রাণকেশ—এঁরা চিলকিগড়ের। পানুবাবুর ভাইপো কিরীটি আজও বেঁচে। বৃদ্ধ। ঝুমুর, পাতা, কীর্তন—এইসব গানে জামবনি মেতে উঠত। কুসুমি থাকত পানুবাবুর সঙ্গে। লক্ষণীয়, যে ঝুমুর ছিল সমবেত আনন্দের আচার, ঔপনিবেশিক কালে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবে, তার নাচনিরূপ এল। পেশাদারি গায়িকার চল হল। রাজার নিয়ন্ত্রণে বা অন্য ভূস্বামীদের পেট্রনেজের প্রভাবে ঝুমুরের পরিবর্তন এল—ফল ভাল হল কিনা বলা সন্দেহ। একদিকে যেমন, এই ঝুমুর গায়িকারা এক নতুন ধরনের পাবলিক কালচারের প্রতীক, তেমনই জঙ্গলমহলে নারীর প্রতি যে বৈষম্য হতো, তারও এক ইঙ্গিত। নাচনির সন্তান সম্পত্তির অধিকার পেত না, রসিকের সঙ্গে থাকলেও, তার সহধর্মিনীর মর্যাদা পেত না, রসিকের স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে হত। কিন্তু এটা ঠিকই, সঙ্গীতনৃত্যকলা শিল্পীর মর্যাদা তাঁরা এই বৈষম্য সত্ত্বেও জঙ্গলমহলের সমাজে পেয়েছেন। সম্পত্তিচ্যুত, বাপ মা হারা, দারিদ্রগ্রস্ত মেয়েরা নাচনির জীবন বেছে নিয়েছে। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় শিল্পীর জীবন, বিনোদিনীর জীবন গ্রহণ করেছে।

জামবনিতে পেশাদার মহিলা শিল্পী আজ নেই বললেই চলে। মানভূমে এখনও আছে, যদিও দ্রুত কমে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে জামবনি তথা সমগ্র জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির একটা পুরনো দিক।

আমি আগেই বলেছি, এটা হল দাসীদের দিক। দেবীদের স্মৃতিতে এটা নেই, তাই স্মৃতিচারণেও এই উপকথা অনুপস্থিত। ঊষাপ্রভা দেবী জগদীশ চন্দ্র দেও ধবলদেবের কন্যা। তাঁর এবং তাঁর বোনের স্মৃতিতে রয়েছে ইঁদপুজোর আচার। ইঁদ করমের পুজো—লোকায়ত সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হল 'গার্ডেনস অব আদোনিস' এবং তারই এক সংস্করণ। বৃক্ষপুজোর এক নজির। সকালবেলা খেতে সারের গর্তে শালের ডাল পোঁতা হতো। চিত্র-বিচিত্র আলপনায় ভরে যেত জমিদারবাড়ির অন্দরমহল। দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরও লেপা হতো। বিভিন্ন শস্যের চারা নেওয়া হতো ডালিতে। মাঝিবউ, মাহাতবউরা তখন ঢুকত মেয়েমহলে। যে ডাল পোঁতা হতো, তাকে বলা হতো 'ইঁদ ডাঙ' বা 'ইঁদ খুটা'। গান গেয়ে মেয়েরা যেত প্রাঙ্গণে বা মাঠে যেখানে ডাল পোঁতা হবে।

ঊষাপ্রভার উল্লেখ করলাম এই জন্য নয় যে ইঁদপুজো উচ্চবর্গীয়দের। এই পুজো সেই অঞ্চলের সর্বসাধারণের। কিন্তু শাস্ত্রীয়করণের দিকটি ও অন্য কিছু দিকের প্রতি নজর ঘোরাতে চাই।

ঊষাপ্রভা ও তাঁর আত্মীয় পরিজনের স্মৃতিচারণের কাঠামোয় বোঝা যায়, ভূস্বামী / কৃষক ব্যবধানকে ছাপিয়ে নারীমনের এক জগত ছিল, যেখানে ঊষাপ্রভাদের স্মৃতি থমকে আছে। রানিমার বনভোজন, মেয়েদের মেলামেশা, দুর্গত কৃষকের হয়ে কৃষকরমণী এসে জমিদারবাড়ির বউদের বিশেষত রানিমার হস্তক্ষেপ চাইছে 'রাজার' কাছে খাজনা মকুবের আবেদন পেশ করার জন্য—তার স্মৃতি, ইঁদপুজোর আচার, বারো মাসে বারো

পার্বণ শস্যচক্রকে ঘিরে, গৃহকর্তা জমিদারের স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন আর পর্দার আড়াল থেকে রাজবাড়ির বিশাল মাঠে গাজনের উৎসব দেখা—এ প্রায় এক অন্য জগত, যেখানে জঙ্গলমহল থেকেও নেই, আঞ্চলিক সংস্কৃতি থেকেও নেই, শাস্ত্রীয়করণ পুরুষতন্ত্র, স্ত্রীআচার, লোকায়ত মানস—সব মিলে মিশে আছে।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'ইঁদ' কথাটির অর্থ কি? সহজ প্রত্যয়ী উত্তর পেয়েছিলাম, কেন, ইঁদ হল ইন্দ্র, ইঁদপুজো মানে ইন্দ্রপূজা। তাহলে ইঁদপুজোয় শস্যাচার কেন? সদুত্তর পাইনি। বঙ্কিম মাহাতর মতে, 'ইঁদে'র অর্থ 'ইন্দ্র' করা সংস্কৃতায়নের একটি দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় 'আদিবাসীদের পৌরহিত্য করতে গেলে সমাজে ব্রাত্য হতে হবে, তাই আদিবাসী রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্ব না দিয়ে ব্রাহ্মণদের উপায় ছিল না; ঠিক একইভাব পরবর্তীকালে কোনও কোনও আদিবাসী গোষ্ঠীকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে হিন্দু গোষ্ঠীতে নিয়ে এসেছিলেন এবং কোনও কোনও গোষ্ঠীকে ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনে উৎসাহও দিয়েছিলেন। এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে কুরমি মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঠিক এইভাবে ঝাড়খণ্ডের অরণ্যমণ্ডলের একটি জনপ্রিয় উৎসবে পৌরহিত্য করতে হলে ধর্মনির দিক দিয়ে কাছাকাছি ইন্দ্রদেবকে টেনে আনা একান্ত প্রয়োজন ছিল।'[২০] বঙ্কিম মাহাত দেখিয়েছেন যে ইঁদপুজো হল বৃক্ষপুজো এক শ্রেণীর গাছের নামবহ। গ্রামের নাম হতে পারে ইঁদবনি, ইঁদভাঙা, ইঁদরাবনি ইত্যাদি। এবং 'বনি' শব্দের পূর্বপদ হিসাবে থাকে কোনও গাছ বা ফলের নাম। তাতে গ্রাম বা অঞ্চলের নাম হয় জামবনি, তুলসিবনি, পলাশবনি, আসনবনি ইত্যাদি। বৃষ্টিকামনা, ফসলকামনা, যৌনমিলনকামনা—এরসঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক কোথায়?

সংস্কৃতায়নের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক নীরবতা মেনে আসার আরেক অভিজ্ঞতা শুনুন। গিধনি রেলস্টেশনের কাছে সে যুগে বীরেন শাসমলমশাই এসে সাঁওতালদের 'ভদ্র' 'হিন্দু' হবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। পুরুলিয়ায় এ জিনিস ঘটেছিল আরও লক্ষণীয়ভাবে। মুক্তির সম্পাদক অরুণ ঘোষ, যাঁর কথা আগে উল্লেখ করেছি, আমায় নিবারণচন্দ্রের একটা জীবনীও উপহার দেন। মানভূমে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের কালে পুরুলিয়ারই আরেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতি দাশগুপ্তের প্রকাশিত **নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের জীবনকথা**। রচনাকাল ১৯৩৯। জঙ্গলমহলের জনসমাজের মধ্যে সংস্কৃতায়ন ঘটানো হতো কীভাবে তার বিবরণ পাওয়া যাবে নিবারণচন্দ্রের জীবনীতে।[২১] আমি বীরেন শাসমলের কথা বা নিবারণচন্দ্রের কথা জানতাম। তাই জামবনিতে যে অভিজ্ঞতা হল, তাতো আশ্চর্য হইনি।

আগে নিবারণচন্দ্রের কথা বলি। তবে বুঝতে সুবিধে হবে। ১৮৭৬-এ ঢাকা জেলায় জন্ম নিবারণচন্দ্রের। কর্মসূত্রে আসেন পুরুলিয়ায়। স্বদেশী আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী শিল্পাশ্রম, সনাতন ধর্ম, 'সাধারণের মধ্যে নীতি বিস্তার', 'ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা দান,' 'চরিত্র গঠন'—এইসবের মধ্যে দিয়ে মহাত্মা নিবারণের জীবন

কেটেছিল।

তাঁর অন্যতম জীবনীকার দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি 'লোক শিক্ষা ও লোকসেবার ক্ষেত্রে লোকাচার দেশাচার মানিতেন না।' 'তিনি ছিলেন আচারপূত নৈষ্ঠিক হিন্দু। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত কাহারও রান্না খাইতেন না। ত্রিসন্ধ্যা করিতেন। গীতা ও উপনিষদের কথা প্রায় বলিতেন। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রকে সম্যক মান্য এবং যথাসম্ভব অনুসরণ করিতেন। হিন্দু শাস্ত্রের সর্বত্র সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেন।' 'রাঁচিতে তানাভগতদের মধ্যে তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল ও খেড়িয়া, হরিজন কর্ম্মীগণ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল।' 'কর্ম্মজীবনে···নিজের আর্য্য আচার ষোল আনা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। এ জন্য প্রায়ই নিজেকে রাঁধিয়া খাইতে হইত।' এটা সেইসময়, যখন মাহাত এবং ভূমিজদের মধ্যে হিন্দুয়ানির প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। তানাভগত আন্দোলনে একটা 'হিন্দুয়ানি' বোধ তো ছিলই।[২২] মালদায় জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বাধীন সাঁওতাল সমাজেও এই বোধ জেগে ওঠে। তনিকা সরকার জিতুর বিষয়ে লিখলেও সংস্কৃতায়নের এই প্রবণতার কোনও বিশ্লেষণ করেননি।[২৩] স্বরাজ্য দলের নেতারা তো বটেই, সব ধরনের জাতীয়তাবাদী নেতারাই বর্ণ এবং উপজাতি দলিতদের এই সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে টেনে আনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন—আর এই কর্মসূচিরই একটি অঙ্গ ছিল তাদের 'হিন্দু', 'সনাতনী', 'ভদ্র,' 'মার্জিত', শিক্ষিত করা। মাহাতদের শেখানো হয় কুরমি ক্ষত্রিয় মহাসভায় যোগ দিতে। সাঁওতাল-মাহাত ঐক্য ১৯৩১-এর জনগণনার পর ভেঙে যায়। তানাভগত আন্দোলনে হিন্দুয়ানি তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় সাঁওতালদের মধ্যেও 'ভদ্র' হয়ে ওঠার চেষ্টা। চেমাইজুড়ি ঘোষণার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। মেয়েদের ব্লাউজ পরতে হবে, মদ খাওয়া চলবে না, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা চলবে না, তুলসিতলায় সন্ধ্যাবেলা যেতে হবে, ছোট করে শাড়ি পরা যাবে না—এই রকম নানা নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয় মেয়েদের ওপর।

সংস্কৃতায়নের এই রাজনীতি লক্ষ করার মতো। ভাষার দিক দিয়ে জঙ্গলমহলের জনসাধারণের উপর শাস্ত্রীয় ভাষার প্রাধান্য চাপিয়ে দেওয়া হয়—ওড়িয়া, বাংলা, হিন্দি। শাস্ত্রীয় আচারের প্রবর্তন হয়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রসার ঘটে। সাম্প্রদায়িক পরিচিতিমূলক সংগঠন বাড়তে থাকে। জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির উপর কয়েক দশকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এক জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি বা শাস্ত্রীয় কৃষ্টি। সমাজে নারীর ভূমিকা সঙ্কুচিত হতে থাকে। সাংস্কৃতিক নীরবতা নেমে আসে মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রেক্ষাপটে।

তাই জামবনিতে আচারের ইতিহাস খুঁজতে বেগ পেতে হয়েছিল। বৈশাখের এক খর দুপুরে গিয়েছিলাম চিলকিগড় থেকে দশ কিলোমিটার দূরে কানিমৌলি গ্রামে। কানিমৌলি হল কানামহুল গ্রাম। এই গ্রামের সীমানা নিয়ে এই শতাব্দীর গোড়ায় জরিপ-বন্দোবস্তের সময় অনেক বিবাদের উদ্রেক হয়েছিল। কানুনগো মৌলভি

এক্রামুদ্দিনের বয়ানে তা ধরা আছে। কানিমৌলিতে থাকতেন সে যুগের এক অবাধ্য প্রজা যাদু মাহাত। নাম ছিল নাকি আসলে যদু। দাপট, সাহস, প্রতিপত্তির জন্য লোকে ডাকত যাদু। যাদু মাহাতর স্মৃতির সন্ধানে গিয়ে বিগত যুগের এক বিদ্রোহী প্রজা, এবং একজন সম্ভ্রান্ত প্রজার হদিশ তো পেলামই, আরও পেলাম সংস্কৃতায়নের এক ছবি। জরিপ-বন্দোবস্তের আর এক্রামুদ্দিনের রিপোর্টের কথা জানতাম, সে নিয়ে অন্য সময় লিখব। যাদু মাহাতর কথা জেনেছিলাম জরিপ বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা সালিশির কাগজপত্রের ভেতর থেকে। বিস্মৃতির তলে ডুবে যাওয়া এক বিদ্রোহী চরিত্র —একশ বছর আগের, যার পারিবারিক ইতিহাস মাহাতদের মধ্যে সংস্কৃতায়নেরও ইতিহাস।

কানিমৌলি গ্রাম শালজঙ্গলের আস্তরণে ঢাকা। সম্পন্ন গ্রাম। মাহাতরা চল্লিশ ঘর, সম্পন্ন চাষি কেউ কেউ। সাঁওতালপাড়াও আছে। গ্রামের বাইরে এক বড় বিল আর পাশে বালি আর ঘাসের শক্ত মাঠ। শক্তিশালী চাষিদের বাড়ির উঁচু মাটির দেওয়াল, বড় বড়, অর্ধেক মাটির অর্ধেক পাকা বাড়ি। বড় গরুর গাড়ির চাকা, লাঙল—দেখলে বোঝা যায়, এ হল তাদের গ্রাম, যাদের বলা চলে 'মেন অব সাবসটানস'। লাঠি, টাঙি, তীরের জোরে জমি রেখেছে একসময়। প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যাদু মাহাতর গোটা এলাকার ওপর।

এই কানিমৌলিতে যাদুরা আসে একশ বছরেরও আগে কুমরি গ্রাম থেকে। ওটাও জামবনি পরগনারই। কুমরি থেকে কানিমৌলিতে এসে বসত করে জমিজমা সামলাতে। যাদু ছিলেন 'পাইওনিয়ার ফার্মার'। জঙ্গল কেটে চাষাবাদ করানোর জন্য ধলভূম থেকে মজুর আনিয়েছিলেন। সেই এলাকার স্বত্ব নিয়ে বিবাদ শুরু হয় জামবনির জমিদার রাজা জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে। ধবলদেব জমিদারবাড়ির সম্পত্তি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ বিবাদে জমিদারির দাবিদার ছিলেন রানি পার্বতীকুমারী। পার্বতীকুমারীকে সমর্থন করেন যাদু। যাদু হন পার্বতীকুমারীর নায়েব। প্রজারা যাদুর ডাকে ঋণ দিতে অস্বীকার করে জগদীশচন্দ্রকে। জগদীশচন্দ্রের মূল সমর্থক উড়িষ্যাগত ব্রাহ্মণেরা—শতপথী, কর, হোতারা। বিশ্বনাথ শতপথী ছিলেন জগদীশচন্দ্রের নায়েব। পার্বতীকুমারী মামলায় হেরে যান, নিঃস্ব হয়ে বিধবা পার্বতীকে বিস্মৃতিতে তলিয়ে যেতে হয়। দেওয়ান বিশ্বনাথের সঙ্গে যাদুর লড়াই সে যুগের জঙ্গল জমি সংক্রান্ত একাধিক মামলায় বিবৃত, যার কথা অন্যত্র বলেছি। যাইহোক যাদু হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী, বাগী। যাদুরা তিন ভাই—রূপচাঁদ, যাদু, বাহাদুর। নিরঞ্জন মাহাত রূপচাঁদের পৌত্র, মথুরামোহনের ছেলে। আমরা কথা বলেছিলাম নিরঞ্জনের সঙ্গে। বয়স তার তখন সত্তরের ঘরে। নিরঞ্জন শৈশবে যাদুকে দেখেছিলেন। যাদু কানিমৌলিতে 'লেজেন্ড' হয়ে গেছেন। নিরঞ্জনের দেওয়া স্মারণিক ইতিহাস আমাদের জন্য ভাষণিক ইতিহাসের চেয়ে কম অর্থবহ হয়নি। নিরঞ্জন বললেন, সে যুগে প্রবাদ চালু ছিল, 'বাঁশবনের যদু, শিলদার মধু'। যাদুর সঙ্গে বারবার জেলে যেতে হয়েছিল ছেলে হরিশচন্দ্র, ধরণীধর

আর শ্রীনিবাসকে। ধরণীধরের ছেলে ধীরেন্দ্রনাথও জড়িয়ে পড়েন কৃষক প্রজা রাজনীতিতে। যাদু মারা যান ১৯২৮-এ বৃদ্ধ বয়সে। তার আগে দাপিয়ে প্রজা রাজনীতি করেছেন। শুনেছি, জমিদারবাড়ির কাছারিতে পিছমোড়া করে বেঁধে তাঁকে মারা হয়েছিল একবার। জল চাইলে পেয়েছিল জলতর জিনিস। যাদু মামলায় সর্বস্বান্ত হন। তবে সে সময় ঋণসালিশি বোর্ডের সদস্য হন, ইউনিয়ন বোর্ড ইলেকশনে জেতেন। সুভাষ বসু কংগ্রেসের হয়ে ঝাড়গ্রামে জনসভা করেন ১৯২৮-এ। মাহাতরা তখন দল বেঁধে নেমে পড়েছে কংগ্রেসের ডাকে স্বদেশী রাজনীতিতে। ঝাড়গ্রামে মাহাতরা গেছিল দল বেঁধে মিটিং শুনতে। শতপথীরা আপত্তি জানায়। পথে এবং ঝাড়গ্রাম শহরে তৃষ্ণার্ত সভাগত কৃষকদের জল দেওয়া মানা ছিল। ক্রোধে মাহাতরা জলের হাঁড়ি ফাটিয়ে দেয়। যাদু আর রূপচাঁদের ছেলেরা ছিল মাহাতদের নেতা।

মাহাতদের নেতৃত্বে প্রজা আন্দোলন তীব্রতা লাভ করেছিল। নিবারণের মনে আছে। রাস্তায় হঠাৎ-হঠাৎ লোক উধাও হয়ে যেত। পরে শোনা যেত, মুশাবনির খনি, ডুয়ার্সের চা-বাগানে নয়ত আসামে 'ডিপুঘর' (কুঠিঘর) হয়ে চালান গেছে। জামবনিতে আরও আগে নীলকুঠি ছিল। এই সব কুঠির মালিক মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি ছিল লোক চালানের পাণ্ডা। যাদু ইস্কুলও করেছিলেন—কুমুদকুমারী বিদ্যালয়। যাদুর কথা—ওরাও রাজা, আমিও রাজা।

এইসব গল্প শুনতে শুনতে নিরঞ্জনকে প্রশ্ন করেছিলাম, এত বিদ্রোহী ধারা যে বংশে, রক্ত যাদের এত গরম, তারা হঠাৎ হিন্দু হতে চাইল কেন? হঠাৎ ধর্ম, আচার ইত্যাদি নিয়ে কেন সেই বিদ্রোহী পরিবার চিন্তান্বিত হল? নিরঞ্জনবাবুর জবানিতেই বলা ভাল। আজ ন-দশ বছর যখন মাত্র বাকি এই শতাব্দী শেষ হতে, সেই অতি-আধুনিক-কালে একটু বিব্রত মনে হয়েছিল নিরঞ্জনবাবুকে পারিবারিক ইতিহাসের এই দিকটা নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করতে বলায়। অবশ্য সেটা ক্ষণিকের। প্রত্যয় ফিরতে কণ্ঠস্বরে সময় লাগেনি।

নিরঞ্জনবাবুর জবানিতে : 'জেল খেটেছি। কংগ্রেসের ডাকে কর বন্ধ করেছি। হাটকর দিইনি। পড়িহাটি হাটে যাদু খুনোখুনিও করেছেন। জঙ্গল কাটা আর বাঁধ লুঠও হয়েছে। বিশ্বাস করেছি, **লাঠি যার মাটি তার**। প্রচুর ক্ষতিপূরণও দিয়েছে আমাদের পরিবার। কিন্তু দেখলাম, ইংরেজ আর জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে **মর্যাদাও** লাগবে। আমাদের বাড়িতে যতগুলো ছেলে, ততগুলো বন্দুক ছিল। তিন-চারটে ঘোড়া, পালকি, তলোয়ার-ঢালও ছিল। চল্লিশ ঘর আর তিনশ লোকের গ্রাম কানিমৌলির, দেখলাম, সম্মানও দরকার। শিবমন্দির হল। মাহাতদের মর্যাদা বাড়াতে সারা ভারত কুরমি ক্ষত্রিয় মহাসভার প্রচার এ অঞ্চলে আমরাই করেছি। যাদু নিজে হলেন মাহাত প্রচারক। নিরঞ্জন মাহাত, মহেন্দ্র মাহাত, সুশীল মাহাত—এঁরা সব আসতেন আমাদের বাড়িতে। ইন্দোর গোয়ালিয়র থেকেও লোক আসত। সিংহদেব, রায়—এদের সঙ্গে বিয়ে হত। প্রাইমারি স্কুল বড় হল, জুনিয়ার হাই হল। সাঁওতাল,

মুণ্ডা, লোধা, মাঝি যারা আমাদের প্রজা, বেগার দিত, তাদের বিবাদের সালিশি করতাম। রাজার বিরুদ্ধে তারা আমাদের দিকেই সায় দিত, কারণ আমরা তাদের দেখতাম। মর্যাদা বাড়াতে ধর্মসংস্কারও হল। পৈতে হল। বৈষ্ণব হল অনেকে। মেয়েদের হাটবাজার যাওয়া হবে না—ঠিক হল। মুর্গি মদ মানা হল। এ পাশে রানিও মারা গেলেন বিষপ্রয়োগে। তবে আমরা জানতাম, শিবাজী, প্রতাপ সিংহ—এরাও কুরমি ক্ষত্রিয়—আমরা এঁদের বংশধর। মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করল, তবে, ঘরে মাস্টার রেখে। চেষ্টা হত নারীশিক্ষক পাবার।' শতাব্দীর গোড়ায় জঙ্গলমহলে প্রজা রাজনীতি যা ছিল, এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ঘূর্ণিতে তার রূপান্তর হল। সংস্কৃতির শাস্ত্রীয়করণ ঘটল। মর্যাদা এসবের ফলে বাড়ল কিনা জানিনা, কিন্তু আচারের রাজনীতি যে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিল, হলফ করে বলা যায়।

কাজেই শাস্ত্রীয়করণের উৎসটা শুধু জঙ্গলমহলের জমিদারবর্গের মধ্যে বা উড়িষ্যাগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে খুঁজলে হবে না, ভূস্বামিত্বের কাঠামো এবং কৃষকদের মধ্যে স্তরায়নের ভেতরেও এই উৎস রয়েছে। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি যা উপনিবেশবাদ এ দেশে নিয়ে এল তা আন্তরসম্প্রদায় সম্পর্ককে যেভাবে পাল্টালো, তার মধ্যেও এই উৎস নিহিত। জামবনিতে শাস্ত্রীয়করণ শুধু চিলকিগড় বা দুবড়া থেকে প্রবর্তিত হল না, হল কানিমোলি থেকেও।

তবে, 'ভদ্র' 'সভ্য' 'মার্জিত' হওয়ার চেষ্টা রাজবাড়ি থেকে যেভাবে শুরু হল, দেখার মতো। চিন্তেশ্বর থেকে পূর্ণচন্দ্র পর্যন্ত—ওটা আরেক শতাব্দী। অনেকটা ওয়াইলড ওয়েস্ট-এর মতো। ঈশ্বরচন্দ্র, তারপর জগদীশ—সভ্য, সংস্কৃত-কৃষ্টি প্রবর্তিত হল জোরকদমে। কাপগেড়িয়ায় স্বদেশী আশ্রমের জন্য জমি দান হল ; রাজা জগদীশ স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করলেন ; সব জাতের এক পঙক্তিতে ভোজনের অনুষ্ঠান চালু হল ; রাজা ধর্ম, তন্ত্র—এ সবের অনেক বই কিনলেন—সংগ্রহ করলেন ; মন্দির সংস্কার শুরু হল জোরকদমে ; আধুনিক নাটক লেখার চেষ্টা করলেন, গীতিকবিতায় হাত দিলেন, ভক্তিগীতিও রচনা করলেন। জামবনিতে আধুনিকতা ঢুকল রাজা জগদীশচন্দ্রের আমলে।

জগদীশ বিরচিত কবিতার ভাষাও সংস্কৃত। ঝুমুর আর অন্যান্য জঙ্গলমহলের গানের ভাষা কুরমালি, নয়ত সে ভাষা একেবারেই লৌকিক। তার কিছু উদাহরণ দিয়েছি। জগদীশের ভাষা সীমান্ত বাংলায় নয়, গাঙেয় বাংলার। জগদীশ লেখাপড়াও করেছিলেন কলকাতায়। তার গীতিকবিতায় লৌকিক কৃষ্টির সে ইন্দ্রিয়মন অনুভূতি নেই, আছে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির ভক্তিভাব। নির্মলেশ আমায় বহু পুরনো কিছু হলুদ কাগজ দিয়েছেন, তার থেকে বলছি।

১

হাম্বীর—মধ্যমান

দিবানিশি বল হরিনাম, পুরাও মনস্কাম

ফুরায়েছে ভবের খেলা, বলে মোরে এই বেলা
অন্তিমে কে শোনাবে রে সুধামাখা হরিনাম ॥
নিজ কর্ম্ম ফলে তুমি, হয়ে আছ মোহে ঢাকা
ডাকিলে না নিরঞ্জনে, ঘুচাবে কে তোমার ব্যথা ;
বুঝিয়ে বুঝ না হায়
কালস্রোত বহে যায়
এখন ডাকরে তাঁরে পাবে অন্ত মুক্তিধাম ॥

২

ছায়ানট—কাওয়ালী

তারা জগৎ জীব তাপহারিণী জননী
দুঃখ হরা দেবী অভয়দায়িনী ॥
পাপে তাপিত তনু
সহিতে পারিনা আর,
ক্ষম মা অপরাধ কলুষনাশিনী ॥
কোলে নে এ সন্তানে
মুছাইয়ে পাপরাশি,
অধমতারিণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥
তুমি মা বিশ্বজননী
অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী,
ফেলোনা সন্তানে মাগো মহেশঘরণী ॥

জগদীশচন্দ্র এইসব ভক্তিগীতি ছাড়া কিন্তু হালকা শ্লেষের কবিতাও রচনা করেন। মাহাতদের চলন বলন নিয়ে ঠাট্টা করা কিছু কবিতা দেখেছিলাম পুরনো কাগজ-পত্রের মধ্যে, কিন্তু সেগুলো পরে আর খুঁজে পাইনি, তবে শ্লেষাত্মক কবিতাগুলোয় হালফ্যাশনের প্রতি বিদ্রূপ আছে। আমাদের দেশে আধুনিকতা আর রক্ষণশীলতা বরাবরই হাত ধরে এসেছে। কাজেই জগদীশ জঙ্গলমহলের প্রবহমান সংস্কৃতি থেকে সরে এসে যেমন শাস্ত্রীয় কৃষ্টির পথে সংগীত রচনা করেন তেমনই শহুরে আধুনিকতাকে বিদ্রূপ করে নানা পদও রচনা করেছেন। তারও এক-আধটা উদাহরণ দিই। এগুলোও নির্মলেশবাবুর সৌজন্যে দেখতে পেয়েছি। রচনা সাল তিরিশের দশক।

৩

ও ভেনভেঁন রাই
গুরুর কিরা তিন চড় লাগাব,
কুচি কুচি করে তোর নাকটা কেটে দেব ॥

ক্যা পরওয়া জান্টুমান হ্যায় যা খুসী তাই করব।
তোদের মত অসভ্য নই গটমট করে চলব ॥
তোদের মত (কি) পান্ত খেয়ে ডিস্ খেঁকশিয়ায় মরব
চা বিস্‌ফট্ পেটে পুরে হাতীর মত হব ॥
হাতে বাঁধব রিষ্টির ঘড়ি দুবেলা যে কামাব
সাফ হতে ডেলি দুবার, ডালি সাবান খাব ॥
রেসেন মাখব পাউডার ঘঁসব আর ভুরুটাকে আঁকব
টোস্ খাব রোস্ খাব আর লেবেনচুস চুষব ॥
কুঁড়্যা পাড়ুয়া বুড়াটাকে কিসের তরে পুষব
বুড়িটাও লক্ষীছাড়ি এবার ঝাঁটা মেরে খেদব ॥
সামাল বেটি রম্ভা চাঁটি দিয়ে নেড়া করব
বড় খেঁচাস, দাঁড়া মাগী, দাঁতগুলো তোর ভাঙ্গব ॥

৪

জংলা-খেমটা

মজেছ খুলে প্রাণ আর কেন জ্বালাও
খুব হয়েছে ভালবাসা, ওহে লম্পটবর ;
তুমি নতুন ফুলে যাও ॥
এখন ওহে মনচোর ভ্রমর হয়ে
পাবে বঁধু নতুন মধু
দাও হে বিদায় ;
শেষের দেখা দেখে যাই প্রাণ,
বারেক দাঁড়াও
নইলে আমার মাথা খাও ॥

৫

বেশী করে বল কি ফল ফলিবে পাউডার
মুখে ঘঁসিয়া
জাপানের সনে চা খড়ি মিশালে কালই
উঠে গো ফুটিয়া ॥
মাথাটি খাইলে রুজ লেপিলে
পরম যতন করিয়া
কথা না শুনিল বেয়াড়া গাহিল
গাল দুটি গেল ঢুকিয়া ॥
আমি বলি শুন আনি গো গাউন
শাড়িটা দাওনা ফেলিয়া

সোনালী করিয়া চুলগুলো দাও
ঘাড়ের কাছেতে ছাঁটিয়া ॥
ধর কাঁটা ছুরি উড়ন চণ্ডীশ্বরী
দরকারী হাত ত্যাজিয়া
নিজে খোঁচা খাও আমারে বাঁচাও
চোখটা দিওনা ফুঁড়িয়া ॥
কিনিনু বিস্তর মার্গেসাঁ আতর
সাঁওতাল মার্কা দেখিয়া
পুরিবে গো আশ বোঁটকা সুবাস
উঠিবে দেহটা ভরিয়া ॥
প্রেম ভিখারী ওগো প্রাণেশ্বরী
দেব ফটোখানি তুলিয়া
এনলার্জ করে সদরে ঝুলাব
রেশমের ডোরে বাঁধিয়া ॥

এতো গেল জগদীশ রচিত কবিতার কথা। যে ভাদুগান নিয়ে আগে আলোচনা হল, সেই গানেরও শাস্ত্রীয়করণ হয়েছিল। তারও উদাহরণ পেয়েছি। বীরেশ্বরবাবু কাশীপুর রাজবাড়ির ভাদুগানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পঞ্চকোট রাজপরিবারের কুমার ধ্রুবেশ্বরলাল সিংহদেও যে গান বাঁধতেন, তার রাগ, তাল, ঠাট শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাকরণে বাঁধা।

১

পিলু-দাদরা

হায় ভাদরে ভাদু বিনা।
কিছুই ভাল লাগে না ॥
যত মনে অন্য ভাবি।
মন কিছুতেই মানে না ॥
বিনা সেই ভাদু শশী।
শূন্য হেরি দশ দিশী ॥
একলা ঘরে রই উদাসী,
মনের আশা মিটে না।
আশা মিটে না,
আশা মিটে না ॥

এই সব গান রাজবাড়ির বাইরেও ছড়িয়েছিল এবং 'দরবারি ভাদু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই শাস্ত্রীয়করণের একটা দিক ছিল শাস্ত্রীয় ভাষার আধিপত্য। জামবনিতে রাজা জগদীশ স্কুল খুললেন, সাধু বাংলার আধিপত্য শুরু হল। মুখে মুখে কথা, প্রবচন, গান—সবই ছিল কুরমালি ধরনের; কথ্য বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, মাদরি ও মুন্ডারি শব্দের মিশ্রন। নতুন ভাষার আধিপত্যে আর দাপটে লোকস্মৃতি হারিয়ে যেতে লাগল। সাংস্কৃতিক নীরবতার অন্যতম কারণ এখানে নিহিত।

ফলে যে লোকভাবনার উল্লেখ আগে করেছি, সেই 'আদি', 'অকৃত্রিম' লোকভাবনা বলে জঙ্গলমহলে কিছু থাকেনি। বঙ্কিম মাহাত বৃষ্টিভাবনা, কৃষিভাবনা, বৃক্ষভাবনা, প্রাণীভাবনা, সর্পভাবনা, প্রকৃতিভাবনা, অগ্নিভাবনা, উপকরণভাবনা, জন্মভাবনা, বিবাহ-ভাবনা, মৃত্যুভাবনা, রোগারোগ্য ভাবনা, শুভাশুভ ভাবনা, কুনজর ভাবনা, ভূতপ্রেত ভাবনা এবং ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালোজাদু ভাবনার কথা বলেছেন। অনেক তথ্যের উল্লেখ থাকলেও বঙ্কিমবাবুর পুরো লেখার আদল উইলিয়াম ক্রুকের **উত্তর ভারতের ধর্ম ও লোককথা** বা **রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফোকলোর অব নর্দার্ন ইন্ডিয়া**। টাইলরের **রিলিজিয়ন ইন প্রিমিটিভ কালচার** ইত্যাকার বইগুলি ফ্রেজারের মূল বক্তব্যের অনুসারী। বঙ্কিমবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন, এগুলি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে বৌদ্ধিক শোষণ ও আধিপত্যের উল্লেখ করলেও জঙ্গলমহলের লোকভাবনার কাঠামো কীভাবে লোকায়ত ও উচ্চমার্গীয় উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে, তার গভীরে যাননি। বঙ্কিমবাবু এও বলেছেন, '...আমি আমার রচনায় ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর নাম আর উচ্চারণ করিনি, কারণ একই সংস্কৃতির ঝাড়খণ্ডি জনপদবর্গকে বিশেষ-বিশেষ জনগোষ্ঠীর ছত্রতলে পৃথকভাবে স্থাপন করে বহুধাবিচ্ছিন্ন রূপে দেখানো হয়ে আসছিল এযাবত, যেখানে সংহতি নিয়ে আসাটাই আমার কাছে একমাত্র লক্ষ্য ছিল।'

বঙ্কিমবাবু এক্ষেত্রেও যে বৌদ্ধিক শোষণের বা আধিপত্যের কথা বলেছেন, সেই আধিপত্যের শিকার হয়েছেন। জঙ্গলমহলে জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে স্বীকার করলে আঞ্চলিক পরিচিতি বা সাংস্কৃতিক পরিচয় মানতে অসুবিধে কেন হবে? সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ; মাহাত, পাহাড়িয়া ইত্যাদি জনগোষ্ঠীসমূহের কিছু স্বকীয়তা তো আছেই; ধলভূম আর মানভূমের মধ্যেও তো কিছু পার্থক্য আছে; ভূমিব্যবস্থার কারণেও স্তরায়ন এসেছে; কাজেই কৃত্রিমভাবে এক জাতিসত্তাগত 'হোমোজেনাস' সংস্কৃতি তুলে ধরার অর্থ ঘুরে ফিরে স্বদেশী রাজনীতির মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক 'সাংস্কৃতিক রাজনীতির' পথ ধরা, যে পথে মনে হয়, গোটা দেশের সাংস্কৃতিক চেহারা এক ও অভিন্ন। এই বিষয়ে আরও কিছু আলোচনায় আবার ফিরতে হবে।

৬

শাস্ত্রীয়করণের প্রসঙ্গ উঠলে মন্দিরের কথা আসবে। জামবনিতে ঘুরতে ঘুরতে একাধিক মন্দির দেখেছি। মন্দিরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির

একটি দিক। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লৌকিক ধর্মভাবনার মধ্যে মন্দিরের স্থান নেই বললেই চলে। তাহলে মন্দির এল কী করে? কী করেই বা রাজানুকূল্যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল, নির্দিষ্ট বিগ্রহ এল, নির্দিষ্ট আচারাদি স্থির হল, জনপ্রিয় হল এবং মন্দির হয়ে রইল জঙ্গলমহলের ভূস্বামী কৃষক সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এক আগ্রহোদ্দীপক নিদর্শন?

মন্দির নিয়ে কিছু আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি, তাই তার পুনরুক্তি করব না। তার সারাংশের উল্লেখ করে আচারের রাজনীতি প্রসঙ্গে মন্দিরের আলোচনায় যেতে চাই। জামবনির কাল্পনিক বংশগাথার দুটি নিদর্শন কিছু বছর আগে পেয়েছিলাম। এই কাল্পনিক কুলজির মধ্যে দেখানোর চেষ্টা ছিল, কীভাবে দেবীর আশির্বাদ ধবলদেবদের উপর সদা বর্ষিত হয়েছে। জঙ্গলমহলে দুর্গা মাতৃদেবীরূপে এলেন কীভাবে তাহও এক ব্যাখ্যা আছে। যে অঞ্চলে রঙ্কিনী ছিলেন মাতৃদেবী, যার জনগোষ্ঠীপ্রধান উৎস জামবনি-ঝাড়গ্রাম-শিলদা-বরাভূম—সর্বত্র পাওয়া যাবে, তাকে দুর্গা স্থানান্তরিত করলেন কীভাবে? নরবলিপ্রথা ধবলদেবরা কীভাবে তুলে দিলেন এবং বংশসমৃদ্ধির প্রতীক রঙ্কিনীকে নিয়ে এলেন ধলভূম থেকে জামবনিতে, তারপর তার পরিবর্তে সাদরে আনলেন দুর্গাকে—এই সব আলোচনা করে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, রঙ্কিনী থেকে দুর্গায় যাওয়া—নিছক এক কাল্পনিক কুলপঞ্জী বিবরণ নয়, জঙ্গলমহলের সমাজে সংস্কৃতায়নের এক ইতিহাস।

বছর তিন-চার আগে জামবনি পুলিশ থানায় ঢুকি দারোগার পুরনো ভিলেজ ক্রাইম নোটবুক দেখতে। এই ক্রাইম নোটবুকের একটা দিক হতো বিভিন্ন গ্রাম সম্পর্কে দারোগাদের ডাইরি করা মন্তব্য। লক্ষ করেছিলাম, এই শতাব্দীর গোড়ায় দারোগারা কনকদুর্গা মন্দির নিয়ে কিছু লিখে যাননি, কিন্তু পাঁচের দশকে মন্দিরের নাম হয়েছে, মেষ বলি হয়, অষ্টমীতে বলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন জনজাতির লোকেরা দলে দলে আসে মা কনকদুর্গাকে দেখতে, প্রণাম করতে, মন্দিরে প্রণামী বিস্তর বেড়ে ওঠে জমিদাররা মন্দির বসিয়েছেন, মন্দিরের সংস্কার করেছেন ১৯২৫-এ, বিগ্রহ চুরি যাওয়ায় নতুন বিগ্রহ স্থাপন করেছেন, কনকদুর্গা মন্দিরকে পরিণত করেছেন চিলকিগড়ের এক নম্বর ট্যুরিস্ট স্পটে। তাই স্বাধীনতার পর এক দারোগার বিস্ময়সূচক মন্তব্য, ডুলুঙ-এর ওপর এই মন্দিরের এত খ্যাতি কীভাবে সম্ভব হল? জামবনিতে বহিরাগত কেউ এলে চিলকিগড় বাদ দেয় না, রাজবাড়ি দেখুক না দেখুক কনকদুর্গা মন্দির দেখতেই হবে। রঙ্কিনীর থান হয়ে গেছে ইতিমধ্যে হেলায় পরিত্যক্ত, অখ্যাত।

সোনার বরণী মা। কনকদুর্গা। রাজবাড়ির প্রতিপত্তি গৌরবের প্রতীক। রাজার সঙ্গে প্রজার সামাজিক চুক্তির এক নিদর্শন, জনজাতিগত কৃষকদের উপর রাজার প্রভাবের এক প্রক্রিয়া। দুর্গা আর সোনায় মোড়ানো নেই ঠিকই—কিন্তু মা ধবলদেবদের দিয়েছেন অনেক, নিশ্চয়ই রাজবাড়ির কারুর কোনও ক্ষোভ এ বিষয়ে নেই, তা আজ চিলকিগড়ের রাজবাড়ি যতই তেলেনাপোতার সেই রহস্যময় পরিত্যক্ত প্রাসাদ মনে হোক

না কেন। ডুলুঙের পাড়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে মন্দির। এই জঙ্গলের জরিপ নিয়ে এক সময় অনেক অশান্তি গেছে। মন্দির তখন সার্ভেয়ারদের কাছে জঙ্গল মাপার এক বড় চিহ্ন। দুবড়ার ষড়ঙ্গীরা এই মন্দিরের পুরোহিত থেকেছেন প্রায় এক শতাব্দী ধরে। দেওয়ান বিশ্বনাথ শতপথী আর শম্ভু ষড়ঙ্গীর বাবা একই সময়ের মানুষ। শম্ভু ষড়ঙ্গীর বয়স যখন নব্বই এর কোঠায়, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। বলেছিলেন, দুপুরুষ আগে এসেছিলেন উড়িষ্যা থেকে গোপীবল্লভপুর পেরিয়ে গত শতাব্দীর গোড়ায়। শম্ভু ষড়ঙ্গী নিজে ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। চিলকিগড় থেকে দুবড়া প্রায় ছ' কিলোমিটার, দারোগার ডাইরিতে দুবড়া নিয়ে নানা মন্তব্য বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। দুবড়া সম্পর্কে দারোগা লিখেছে, দুবড়া উড়ে বামুনদের গ্রাম। কলহপ্রিয় এরা। প্রতিপত্তিশালী, দলবাজি করে। শম্ভু ষড়ঙ্গীর লেখা রাজবাড়ির বংশগাথায় কীভাবে দুবড়ার ব্রাহ্মণদের আশির্বাদে চিলকিগড়ের মল্লক্ষত্রিয় জমিদারদের শ্রীবৃদ্ধি হল, তার সবিস্তার বিবরণ আছে। এইসব বিচার থেকে মনে হয় কনকদুর্গা মন্দির শুধু রাজা-প্রজার সম্পর্কের প্রতীক নয়, যোদ্ধা এবং পুরোহিতের সম্পর্কেরও।

ধবলদেবদের সম্পত্তি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ধলভূমের সম্পত্তি পেয়ে বিশাল হয়ে ওঠে। গোটা জামবনি আর ধলভূমগড় একই জমিদারির তলায় আসে। মা কনকদুর্গার আশির্বাদ ছাড়া এ অসম্ভব ছিল—শম্ভু ষড়ঙ্গীর এই হল সাক্ষ্য। মহিলাদের হাতে জামবনি জমিদারি আর ঘাটশীলার জমিদার শত্রুঘ্ন ধবলদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের মহিলাদের হাতে ধলভূমের সম্পত্তি যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে এই ধলভূম জমিদারিকে জামবনির সঙ্গে যুক্ত করা—এ সবই হয় দেওয়ান বিশ্বনাথ শতপথীর তত্ত্বাবধানে, কেননা রাজা জগদীশ তখনও নাবালক। বিশ্বনাথ শতপথী নিজে একটা মন্দির করান দুবড়ায়। এপাশে কনকদুর্গার হাল ধরলেন ষড়ঙ্গীরা। সমৃদ্ধি আসার সুবাদে ক্রমে ক্রমে রাজপ্রাঙ্গণেই তৈরি হল আরও তিনটি মন্দির—একটি সাক্ষাত উড়িষ্যা-শৈলীতে—শিব, রাধাকৃষ্ণ আর এক নবরত্ন মন্দির বলরাম।

মন্দিরের রাজনীতি শুরু হল এবার অন্তঃসলিলা কিন্তু দারুণ ফলবতীভাবে। উড়িষ্যা ব্রাহ্মণেরা রাজবাড়ির মন্দিরগুলোরও হাল ধরলেন। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমিও কম পেলেন না, যার নিদর্শন আমি অন্যত্র দিয়েছি। মাহাত, সাঁওতাল, মাঝি, মুন্ডা, ডোম, কাহার, ভূমিজ—এই প্রজাবর্গের এক সংস্কৃতি; ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, কায়স্থ—এদের আরেক। এই দুই সংস্কৃতির চেহারা ভিন্ন। কিন্তু খুব বিবাদ হল না। কারণ, মন্দির দেখেনি যে সাঁওতাল, সে এবার মন্দিরে গেল। ছো, টুসু, ভাদু, ঝুমুর, যাদুনৃত্য—এ সবের ধার দিয়েও যার যাওয়ার কথা নয়, সেই রাজা আর তার লোকেরা এ সবের চর্চা শুরু করল, অবশ্যই নিজেদের মতো করে, শাস্ত্রীয় উপাদানে অন্বিত করে। তাই দুবড়া থেকে কেন গাজন পর্ব শুরু, বোঝা যায়। মা কনকদুর্গার মন্দির এই গাজনের মিছিলের রুটের প্রায় মাঝে।

কনকদুর্গার নতুন মন্দির বসল যে জায়গায়, ডুলুঙের ধারে জঙ্গলের মাঝে, সেখানেই

নাকি জগন্নাথ ধবলদেব বসিয়েছিলেন পুরনো দুর্গা মন্দির। মা ভক্ত পূজারী চেয়েছিলেন, নরবলি চাননি। এটা প্রায় দুশো বছর আগের কথা বলছি। মন্দিরের ওই জায়গায় ধবলদেবের আগে এক পূজারী রাজত্ব করত, জনশ্রুতি রয়েছে। তার প্রাসাদ মন্দিরের পাশে টিবির তলায়, রাজবাড়ির লোকজনের কাছে এও শুনেছি। পুরনো আর নতুন মন্দিরের বৈপরীত্য চোখে পড়ার মতো; তার চেয়েও বড় কথা, পুরনো মন্দিরের গায়ে এক অত্যাশ্চর্য রিলিফ—একটি লোক তার জননাঙ্গ ধরে কারুর দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে!

নির্মলেশবাবুর কাছে জেনেছি, এক সময় পুরনো মন্দিরের চূড়োর কাছে গোটা দেওয়াল জুড়ে আর নিচেও ওইরকম মৈথুনমূর্তি ছিল। এখন মন্দিরের গায়ের পলেস্তারা স্থানে-স্থানে খসানো, মূর্তিগুলো চেঁচে তুলে দেওয়া হয়েছে। কী কারণে, ওই একটা রসাত্মক মূর্তি রয়ে গেছে। দুর্গা মন্দিরের গায়ে ওইসব মূর্তি দুশো বছর আগে আঁকা। দেখে ফের মনে হয়েছে জঙ্গলমহলের 'ওয়াইলড ওয়েস্ট' অতীতের কথা। কিন্তু মূর্তিগুলো খসালো কে? শুনেছি, ১৯২৩-২৫-এর ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় এই কাণ্ড ঘটেছে।

জামবনির ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মোর্চায় চিড় ধরে এই শতাব্দীর বিশের দশকের গোড়ায়। জেমসন সাহেব নির্দেশিত জরিপ বন্দোবস্ত অভিযান শেষ হবার পর জামবনিতে সামাজিক অসন্তোষের পালা শুরু হয়। ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর জমি কোথাও-কোথাও জমিদার ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিছু নিষ্কর জমিতে রাজা নিজে চাষাবাদের চেষ্টা শুরু করে। আসনবনির হোতাদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়। তারপর ১৯২৩-এ ব্যাপক প্রজা আন্দোলন শুরু হলে, দেখা গেল ব্রাহ্মণরা রাজার পক্ষে না গিয়ে মণ্ডলদের পক্ষ ধরেছে। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করেছি। কৃষি ব্যবস্থায় খাজনা-সঙ্কট, খাস জমি বাড়ানোর চেষ্টা, নিষ্কর জমির পরিবর্তন, মণ্ডলদের ভূমিকা—এই সব। যাই হোক, জমি বন্দোবস্ত, খাজনা-সঙ্কট হয়ত একটা বড় কারণ ছিল। শম্ভু ষড়ঙ্গী মারা গেছেন। শম্ভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কিছু কিছু জেনেছিলাম। ভবানী রাণা নামে চিলকিগড়ের এক পুরনো সেরেস্তা কর্মচারীর কাছেও একই ভাষ্য পেয়েছি।

এদের জবানি অনুযায়ী, দুবড়ার ব্রাহ্মণেরা এই সময় নাগাদ কনকদুর্গা মন্দিরের পুরুতগিরি আর চালাতে অস্বীকার করে, বা রাজা জগদীশই তা বন্ধ করে দেন। দুবড়ায় পালটা দুর্গা মন্দির স্থাপিত হয়। শম্ভু ষড়ঙ্গী নিজে তার অন্যতম উদ্যোক্তা। জামবনির মুসলমান দারোগা দুবড়ার এই উদ্যোগকে মদত দেন। তার উপস্থিতিতে যে বয়ান ভিত্তিপত্রে লেখা হয়, তা এখন ফটো করে শম্ভুর বাড়িতে রাখা। আমি দেখেছি।

ব্রাহ্মণরা এই সময় নাগাদ রাজা জগদীশের স্থাপিত স্কুলে সংস্কৃত, বাংলা লেখাপড়া, শাস্ত্রীয় ভজন, ধর্মশিক্ষা—এ সবের ওপর জোর দিয়েছিল। আমি আগে উল্লেখ করেছি, বীরেন শাসমলমশাই এই সময় নাগাদ গিধনিতে সাঁওতালদের 'হিন্দু' হতে, 'ভদ্র', 'সংস্কৃত' হতে ধর্মসভা করেছিলেন। মাহাত আর ভূমিজদের সংস্কার আন্দোলনও শুরু

হয় বিশের দশকের গোড়ায়। সব দেখে মনে হয়, রাজা জগদীশ হয়ত ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করতে মন্দিরকে 'পবিত্র', 'পরিষ্কার' করার ব্যবস্থা করেন এই সময় নাগাদ। তবে এ সবই জল্পনা। হলফ করে কিছু বলা যায় না। পুরনো মন্দির এর পরই ধীরে-ধীরে অবহেলিত হতে লাগল। উত্তরভারত থেকে কারিগর ওস্তাদ এল নতুন মন্দিরের নকশা নিয়ে। রাজবাড়িতেও বহির্ভবনের রূপে নতুন সংযোজন হল। নতুন তিনটে মন্দির বসল। দুবড়ার পুরোহিতরা ফিরে এল স্বমহিমায়, সগৌরবে। বলা চলে জামবনির ইতিহাসে মডার্নিটি নিশ্চিতভাবেই এসে গেল দুইয়ের দশকে।

রাজা জগদীশের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও তন্ত্র, গীতা, উপনিষদ, বিভিন্ন ভাষ্য ইত্যাদি যে সব বই দেখেছি, তার অধিকাংশের তারিখ দুইয়ের দশকের। একটা খাতাও দেখেছি— জগদীশের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের খাতা। তাতে দেখেছি, গ্রন্থাগারের বই নিচ্ছেনও জামবনির শিক্ষিতসমাজ দুই-তিন দশকে। অর্ধেক পোকায় খাওয়া বলে এই খাতায় সব বইয়ের হদিশ পাইনি। তবে যেটুকু দেখেছি, তাতে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, 'আধুনিক', 'হিন্দু', 'সভ্য' ও 'শিক্ষিত' হবার পথে জামবনির ইতিহাসে দুইয়ের দশক একটা মাইলস্টোন।

মন্দিরের কথায় ফিরে আসি। দারোগা যেমন জামবনিতে কনকদুর্গা মন্দিরের জনপ্রিয়তায় বিস্মিত, তেমনই বিস্ময়ের ব্যাপার অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজাপার্বণ (৫ খণ্ড)'-এ এই মন্দির, তাকে ঘিরে জনসমাগমের উল্লেখ নেই। তেমনই ১৯৬১-র ম্যাককাচিয়নের মেদিনীপুরের মন্দির সম্পর্কে প্রতিবেদন, **নোটস অন সাম রিপ্রেজেনটেটিভ টেমপলস অব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট**-এ কনকদুর্গা মন্দিরের উল্লেখ অনুপস্থিত। বিনয় ঘোষমশাইয়ের অনুমান ছিল, কনকদুর্গা মেদিনীপুরের, এমনকি জঙ্গলমহলেরও, কোনও অভিজাত মন্দির নয়। পুরনো পঞ্চরত্ন মন্দিরের পাশে নতুন নাটমন্দিরসহ এই মন্দিরের কনকদুর্গা আসলে কোনও বনদেবী বা বনদুর্গার কনকমণ্ডিত সংস্করণ। অর্থব্যয়ের পরিচয় থাকলেও, নতুন মন্দিরে শিল্পরুচির পরিচয় নেই।

বিনয় ঘোষের এই অনুমানের স্বপক্ষে কোনও জোরালো প্রমাণ নেই। তবে হরপার্বতী, শিবদুর্গা—এ থেকে মনে হয় ভৈরব-ভৈরবী হতে পারে ; দুর্গা তো ভৈরবীও। ভৈরবপূজা একসময় জামবনির কাছে শিলদায় খুব প্রচলিত ছিল। তার থেকে ভৈরবী, বনদুর্গা, জমিদারের কল্যাণে কনকদুর্গা। **ভৈরবরঙ্কিনীমাহাত্ম্যে** বলা আছে :

ভৈরব ভৈরবী স্থানে দেখ একই পর্ব।
লুপ্ত হয় ক্রমে ক্রমে দেব কীর্তি সর্ব ॥
একই সাম্রাজ্যভুক্তা ছিলা ঘাটশীলা।
শিলদা সাঁতভূম কালে পৃথক হইলা ॥
ঘাটশীলা শিলাস্তরে উৎপত্তি শিলদার।
সাঁতভূম শ্রীকৈলাসে বসতি বাবার ॥

কনকদুর্গা এলেন বনদুর্গা থেকে—আক্ষরিক অর্থেই জঙ্গল এখানে ছিল সোনা। কিন্তু একটা বাড়তি অনুমানও করি। চিল্কিগড়, জামবনি, দুবড়া, চিচঁড়া, গিধনি—এত জায়গা থাকতে, ডুলুঙের ধারে অত গহন অরণ্যে মন্দির কেন? পুরনো পঞ্চরত্ন মন্দির কি সত্যিই কোনও বনদেবীর ছিল? বিগ্রহ চুরি গেছে দুইয়ের দশকে, কোনও ছবি নেই, বিগ্রহের কোনও বিবরণ জামবনিতে পাওয়া পুরনো পুঁথিতে পাইনি। কাজেই আদিতে কনকদুর্গা কোন কল্পে রচিত হয়েছিলেন, তার স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শন দিতে পারব না। তবে ভৈরব, রঙ্কিনী, ধর্মঠাকুরের কামিন্যামূর্তি, প্রেতিনী, বনদুর্গা—এ সবই এক এক এলাকায় অরণ্যপ্রধান বসতির জনসাধারণের পূজ্য দেবদেবী। ক্রমে স্থানীয় সামন্তরাজাদের পোষকতায় এক-একজন এক-এক অঞ্চলের অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও দেবীরূপে গণ্য হয়েছেন। কল্পনাস্ফীত কিংবদন্তীর মাঝে রয়ে গেছে দুশো তিনশো বছরের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র।

দুটো মন্দিরের সম্পর্কেই আরও একটা-দুটো কথা বলা যায়, জামবনির সংস্কৃতির কাঠামো আরও ভাল করে বোঝার জন্য। কনকদুর্গা আর বলরাম মন্দির। হিতেশ সান্যাল মন্দির প্রসঙ্গে এনেছিলেন সামাজিক গতিশীলতা বা 'সোশ্যাল মবিলিটি'র কথা। এই সামাজিক গতিশীলতা জামবনির সাংস্কৃতিক চালচিত্রে আচারাদি বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা দেখিয়েছি। যে দুটো মন্দিরের কথা বললাম, তাতে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানেন, বাংলাদেশে বিষ্ণুপুজোর চল ছিল। তাই বিষ্ণুপুজো জনপ্রিয় হবার পরও, এই বিষ্ণু বৈদিক 'আদিত্য-বিষ্ণু' থাকেননি, পৌরাণিক বিষ্ণু বাসুদেব, নারায়ণ ও বৈদিক বিষ্ণুর সংমিশ্রণ হয়ে উঠেছেন। পালরাজাদের সময়ের বহু বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেছে বলরামেরও পৃথক পুজো হয়েছে। কেননা, এই বিষ্ণু চতুর্মূর্তি—কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম, পুত্র ও পৌত্র প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং বিষ্ণু নিজে। আমার প্রথমে প্রশ্ন জেগেছিল, মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে একই সঙ্গে শিবপুজো আর বলরামপুজোর নিদর্শন দেখি কীভাবে? পৌরাণিক যুগে শিব সংহারক হলেও প্রাক-পৌরাণিককালে তিনি জগতস্রষ্টা; লিঙ্গ এই স্রষ্টাভূমিকা ও দেবতার পিতৃত্বের পরিচায়ক। তাই বিষ্ণু ও এক/চতুর্মুখলিঙ্গের সহাবস্থানে পরে আর বিস্মিত হইনি। ধবলদেবদের এমন কোনও লেখা পাইনি, যেখানে বলা আছে, কেন এই মন্দিরগুলি বসল। শিবমন্দির আর বলরামমন্দির দেখে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে, জঙ্গলমহলের মল্লক্ষত্রিয় জমিদাররা যতই সংস্কৃত ও শাস্ত্রীয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন না কেন, উৎপত্তির টান এড়াতে পারেননি। অ-শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি এবং লোকায়ত সংস্কৃতি প্রতিপদে ভূস্বামীদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে রোধ করতে উদ্যত হয়েছে স্বীয় সাংস্কৃতিক শক্তি দিয়ে। ছো নাচের আচারেও আমরা দেখেছি এক মিশ্র সংস্কৃতির জগত, মন্দির গঠনেও এই মিশ্র সংস্কৃতি তার আভাস রেখে গেছে।

জামবনিতে পথে ঘুরতে ঘুরতে গাছের তলায় মৃৎশিল্পের যে নিদর্শন দেখা যায়,

সর্পরূপী মনসা, ধর্মঠাকুর, হাতি, ঘোড়া, অন্য বন্যজন্তু—এই সব, জামবনির মন্দিরের সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে স্থাপন করা তাই মনে হয় অনৈতিহাসিক হবে। গাছের তলায়, রোদে, বৃষ্টিতে পড়ে থাকা আরাধ্য দেবতা থেকে মন্দিরের আলয়ে স্থান পাওয়া দেব-দেবী—জামবনিতে ধর্মাচারের এই বিন্যাসে যেমন লোকধর্ম আর শিল্পকলা জড়িয়ে আছে, তেমনই এই বিন্যাসে কৃষক-ভূস্বামী আন্তঃসম্পর্ক, অরণ্যময় প্রকৃতি এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদের সম্পর্কও প্রতীয়মান।

কনকদুর্গা মন্দির পোড়ামাটির। এ প্রশ্নও জাগে, পাথুরে এলাকা হওয়া সত্ত্বেও গাঙ্গেয় বাংলার মন্দিরের স্থাপত্যরীতির প্রভাব এখানে কী করে পড়ল? সুন্দর অলংকারবহুল পোড়ামাটির প্রতিকৃতি, চিত্রফলক রয়েছে কনকদুর্গা মন্দিরে। একই উৎকৃতি জমিদারবাড়ির মন্দিরগুলোতেও। উড়িষ্যার প্রভাবে কনকদুর্গা মন্দির হয়েছে পঞ্চরত্ন, বলরাম নবরত্ন। সবদিক থেকে মনে হয়, এ সত্যই সীমান্ত সংস্কৃতি, ধর্মমানস, লোকাচার। সরসী সরস্বতী একসময় মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস রচনায় কাজ হবে অত্যন্ত দুরূহ। যেটুকু তথ্য পাওয়া, সবই ধর্ম-সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পের এই অর্ধ-অন্ধকার চেহারা জঙ্গলমহলের অন্ধকারে আরও অজানা থেকে গেছে।

এই কারুশিল্পীরা এসেছিল কোথা থেকে? ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, জামবনি, বীনপুর—এ সব অঞ্চলে কোনও সংখ্যাবহুল কারুজীবী সম্প্রদায়ের কথা জানি না। কাঁথি-তমলুক-মহিষাদল অঞ্চলের মতো এ অঞ্চল মন্দিরপ্রধানও নয়। তবে কি এসেছিল বাঁকুড়া থেকে? বাঁকুড়া জামবনির লাগোয়া। বৈবাহিক, বাণিজ্যিক, কুলগত সম্পর্কাদি মল্লভূম ও ধলভূমে ছিলই। বাঁকুড়ার মন্দির ভাস্কর্য আলোচনা প্রসঙ্গে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়মশাই উল্লেখ করেছেন মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে ঈষদন্নত 'রিলিফ' প্রকরণের কথা। এই 'রা-রিলিফ' বা bas-relief পুরনো কনকদুর্গা মন্দিরেও রয়েছে।

ধলভূমের রাজনীতি, আচার, সংস্কৃতির আলোচনা করতে গেলে অবশ্য মল্লভূমের কথা আরও বেশি মনে পড়া স্বাভাবিক। মল্লরাজবংশের উৎপত্তি-ইতিহাস সংক্রান্ত অতিকথা এবং ধলভূমের কুলজী ইতিহাসের মাঝে বিস্তর মিল। সিংহভূম, মানভূম, বরাভূম—এই অঞ্চলের মাঝে রাঢ় সংস্কৃতি, সীমান্ত সংস্কৃতি, কৌম সাংস্কৃতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যও ন্যালে সাহেব তাঁর **বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট-গেজেটিয়ারে** স্বীকার করেছিলেন। হান্টারের **গ্রামবাংলার ইতিকথা** বা **অ্যানালস অব রুর‍্যাল বেংগল** ও বিষ্ণুপুর রাজবংশের যে কিংবদন্তী-আশ্রিত উৎপত্তি ইতিহাস পাই, তাতে স্থানীয় সামন্ত নৃপতিদের জনজাতিগত আদিকথার উল্লেখ আছে। একইভাবে ওলডহ্যামের **সাম্ হিসটরিক্যাল অ্যান্ড এথনিক্যাল আস-পেক্টস অব দ্য বার্ডেয়ান ডিস্ট্রিক্ট**-এ মল্লদের সম্পর্কে বলা আছে, এঁরা মাল উপজাতির। লোকায়ত ও শাস্ত্রীয় আচার সমন্বয় চিহ্ন বাঁকুড়াতেও স্পষ্ট। সোনামুখি, পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পীরা যেভাবে মনসাচালি আর মনসাঘট তৈরি করেছেন, তাতে মনে হয় এই সহস্র

সহস্র মূর্তির প্রভাব জামবনিতে পড়তে পারে। বাঁকুড়ার এক বড় অঞ্চল ছিল পুরনো জঙ্গলমহলের একাংশ। কাজেই গোষ্ঠীপ্রতীক বা টোটেম রূপে নানা জন্তুজানোয়ারের মূর্তির ব্যবহার, ছো নাচে বিভিন্ন পশুকে নিয়ে পালা, মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ এই সব পশুপাখির মূর্তি—এগুলো বাঁকুড়ায় যেমন জনপ্রিয়, তেমনই জামবনিতে। চড়ক সংক্রান্তি এবং শিবের গাজনের জনপ্রিয়তা এই লেখার প্রথমেই এনেছিলাম। অশোক মিত্রমশাই ১৯৫১-তে যে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক সম্পাদনা করেন, তাতে ২০১টি উৎসবের মধ্যে ১১৬টিই হয় চড়ক নয় গাজন। সংক্ষেপে বলা চলে জঙ্গলমহলের সাংস্কৃতিক পটে আমি জামবনি-চিলকিগড়কে বোঝার চেষ্টা করেছি। তাই মল্লভূম, মানভূম, বরাভূম, সিংভূম, ধলভূম—এই নামগুলো ওলটপালট হয়ে গেছে। একটা লিখতে গিয়ে নিজের অজান্তে এসে গেছে অন্যটির কথা। একসময়ের জঙ্গলমহল, আজকে ঝাড়খণ্ডের ক্রমবিস্তৃত ছায়া যেমন জামবনির ইতিহাসকে ঢেকে ফেলেছে (না কী বলব, তৈরী করেছে), তেমন এই লেখায় সেই ছায়াতেই জামবনির আচারের ইতিহাস বিধৃত।

আচারের সমগ্র ইতিহাসকে এক ভাষাণিক ধারা বা ডিসকোর্স হিসাবে দেখলে তাই মনে হয়, জঙ্গলমহলের সংস্কৃতির বিবরণ শুধু সাংস্কৃতিক জাতিকথাবিবরণ বা কালচারাল এথনোগ্রাফি হয়ে থাকবে না, তার ইতিহাসও রচনা করা যাবে। এলাকাগত ইতিহাস, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে এবং জঙ্গলমহলের বিভিন্ন অংশের মাঝে যোগাযোগ, কৃষ্টি, ধর্ম, স্থাপত্য—এই সব মিলিয়ে তৈরী আচারমণ্ডলীর যে ভাষাণিক ধারা, তাকে পাওয়া যাবে। অন্ধকার অনেকটাই কাটবে। **সাংস্কৃতিক নীরবতার** উল্টোদিকে **সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা বা বাঙ্ময়তাও** যে বিদ্যমান, তা' আমরা বুঝতে পারব। এই **বাঙ্ময়তাই** হল এক-একটি জনমণ্ডলীর জাতীয় ইতিহাস গড়ে ওঠার উপাদান—ইতিহাসচর্চাগত দ্যোতক।

৭

আচারাদির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বাঙ্ময়তা প্রকাশ পায়, বলেছি। তাই জামবনির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচারাদির কোনও লিখিত ইতিহাস না থাকলেও, শাস্ত্রীয়-করণের প্রভাব আপাত / সার্বভৌম মনে হলেও জামবনির জনসাধারণের সাংস্কৃতিক আখ্যান লিখতে দমে যাওয়া উচিত নয়। তার কারণ, লোকায়ত সংস্কৃতি শুধু শাসক সংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্র নয়, শাসক আধিপত্য রোধেরও ক্ষেত্র। কিন্তু এর অর্থ দাঁড়ায় না যে শাসক সংস্কৃতির বিপরীত, বিচ্ছিন্নতায় এবং স্বাতন্ত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকায়ত সংস্কৃতি। লোকায়ত সংস্কৃতি **লোকায়ত** হয়ে উঠছে এবং লোকভাবনা **সাংস্কৃতিক রূপ** পরিগ্রহ করছে শাসক সংস্কৃতির সংপর্শে, দুই পরিমণ্ডলের অন্তর্ভেদনে, মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতায়, পারস্পরিক যোগাযোগে। তাই খানিকটা নিশ্চিত হয়েই বলা যায়, শাসক সংস্কৃতির সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোনও লোকায়ত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না! লোকায়ত সংস্কৃতির তেমন কোনও পবিত্র, নিখাদ, আদিকল্প নেই!

জামবনির সংস্কৃতির কাঠামোগত এই রূপটি দেখতে পাব, ভাষণিক ধারার রূপটি লক্ষ করলে। জামবনি, শিলদা, বরাভূম, মল্লভূম—সর্বত্র যে রাজবংশোৎপত্তিগত কল্পকথা পাই, তাতে দেখা যায় **ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনী** প্রায় **ধর্মীয় জীবনী** হয়ে উঠেছে এবং **ধর্মীয়** হয়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিকতাকে অবলম্বন করে। শিলদার **ভৈরবরাম্বিকনীমাহাত্ম্যের** উল্লেখ করেছি। **জামবনিকুলবিবরণ** নিয়ে এখানে কিছু মন্তব্য করব। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করেছি। এখানে যা বলব, তা শুধু জীবনী হিসাবে এই বিবরণের ভাষণিক কাঠামো নিয়ে। **জামবনিকুলবিবরণের** সমস্যা হল, দুশো বছরের আগের এক চরিত্রকে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কিন্তু নিছক ঐতিহাসিক চরিত্র হলে মর্যাদা থাকে না, তাই এই চরিত্রতে ধর্মীয়তা আরোপ করা চাই। আলবার্ট সোয়েৎজার লিখেছিলেন **ঐতিহাসিক যীশুর সন্ধানে—ইন সার্চ অব দ্য হিস্টরিকাল যেসাস**। অমূল্য সেন অনুরূপ এক ঐতিহাসিক চরিত্রকে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন অতিকথার আবরণ ভেদ করে—**ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য**। কিন্তু তা তো আধুনিক যুক্তিবাদী মনের কথা। জামবনির জীবনীকারের সমস্যা ঠিক এর বিপরীত। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত যে সামন্তবংশ, তার আদিপুরুষের ঐতিহাসিকতাকে কী করে লীন করে দেওয়া যায়—চরিত্রটিকে নৈর্ব্যক্তিক করে, ধর্মীয়তায় ঢেকে দিয়ে। তাই পুরী যাত্রা, দেবীর লীলা, স্বপ্নাদেশ, রাজাপত্তন, অঞ্চলের লোকেদের ধর্মমতে প্রজাপালন—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জগন্নাথ ধবলদেবকে তো নিছক ধর্মীয় চরিত্র করলে চলবে না। তাকে ন্যায়পরায়ণ, ক্ষমতাশালী রাজা রূপে দেখাতে হবে। তার প্রায় দেড়শ' বছর পরের জগদীশ ধবলদেব তো আরও, রক্তমাংসের মানুষ। কাজেই ধর্মীয়তা আরোপের সীমা আছে। এই সমস্যা বা দ্বান্দ্বিকতার টানাপোড়েনে পড়ে জঙ্গলমহলের রূপকাশ্রিত বংশকাহিনীগুলো **সময়ের** দুই চেতনার মাঝে দোলায়মান। একদিকে জীবনী লিখতে গিয়ে হাজির করতে হচ্ছে **ঐতিহাসিক** সময়, প্রকৃত সময়। অন্যদিকে ধর্মীয়তার খাতিরে **অতিকথাময়** সময়, **লীলান্বিত** সময়। জঙ্গলমহলের রাজক্ষমতা ঐতিহাসিক এবং দৈবীও। যতক্ষণ একটি জনমণ্ডলীর প্রতিভূ হলেন রাজা / জমিদার, ততক্ষণ জীবনীকারের এই রণনীতি সফল। কিন্তু যেই এই সামাজিকমণ্ডলী অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে পড়ছে—রাজা-প্রজায় দ্বন্দ্ব, মণ্ডলীর নানা স্তরের মাঝে দ্বন্দ্ব, জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্ব, সোজা কথায় কৃষক-বিদ্রোহ যখন ঐতিহাসিক বাস্তবতারূপে আবির্ভূত হচ্ছে, তখন জীবনীকারের জীবনী রচনার এই রণনীতি ব্যর্থ। তার কারণ, তখন দেখাতে হবে কৃষক / প্রজা / জনসাধারণ অধার্মিক, অকৃতজ্ঞ। কিন্তু তা দেখালেও কিন্তু অনুচ্চারিতভাবে হলেও ধরে নেওয়া হয়েছে, সেই সামাজিক চুক্তির ন্যায্যতা বা কর্মকারিতা আর থাকছে না। রাজশাসন / জমিদারশাসনের দুটি স্তম্ভের একটি থাকলেও অপরটি মরে যাচ্ছে—ঐতিহাসিক ক্ষমতা উপস্থিত কিন্তু নীতিগত যৌক্তিকতা গত। জঙ্গলমহলের ঝাড়খণ্ডরূপে পুনর্জন্মে তাই পুরনোদিনের কুলজীকাহিনীগুলোর উপযোগিতা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অনুরূপ লোকায়ত কাহিনীগুলোরও একটা ভাষণিক কাঠামো আছে। ছো, টুসু,

ভাদু এবং বিশেষত ঝুমুরের কথকতার কিছু উল্লেখ করেছি। দেখা যাবে, জামবনির এই লোকসঙ্গীত ও লোককাহিনীতে যে ভাষণিক বা **ওরাল** ধারা পাওয়া যায়, তাতে দুটি অভিজ্ঞতা পাশাপাশি বিধৃত—সর্বজনীন বা যৌথ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি ও প্রকাশ। দুটি সময়ও পাশাপাশি বিধৃত। একটি হল নির্দিষ্ট সময়—সেই কাল যখন জঙ্গল কেটে আবাদ হচ্ছে, বসত হচ্ছে, রাজা আসছে, কুঠিয়াল আছে, আসামে চালান যেতে হচ্ছে, অরণ্যকে ঘিরে নানা উৎসবের গোড়াপত্তন ; অন্যটি হল নির্দিষ্ট কালাতিক্রমকারী কাল, যখন মনে হয় এই অভিজ্ঞতা চিরন্তন। বিধৃত রয়েছে কথক ও শ্রোতার দুটি শক্তিও। ছো প্রসঙ্গে দেখিয়েছি 'জাগরণের' গুরুত্ব। শিবের জন্য জাগতে হবে। কৃষকরা জেগে রইবে। কিন্তু জাগিয়ে রাখবে কে ? কে নাচবে, গল্প বলবে এই নাচের সময় ? ভূমিজ, মাঝি, ডোমেরা। ভূমিজরা এই এলাকার উদ্যমী কৃষক। দণ্ডচ্ছত্র মাঝিরাও তাই। ডোমেরা ভূমিহীন, অস্পৃশ্য, বাজনদার। এই বৈততায় সম্প্রদায় বিন্যাস আছে কিন্তু উচ্চনিচ ক্রমপর্যায়ের নয়। সবশেষে বিধৃত আছে নৈতিকতা সংক্রান্ত দুটি শক্তিও—শুভ, অশুভ। অকরুণ প্রকৃতি আছে, মন্বন্তর-আকাল আছে, নিষ্ঠুর শাশুড়ি আছে, বন্য হিংস্র প্রাণী আছে, কুঠিয়াল আছে, শয়তান আছে, দৈত্য দানব দানব, ডাইন-ডাইনি। বিপরীত সহৃদয় প্রকৃতি, পৌষপার্বণ, গোলায় ওঠা ধান, অভাগিনী নারী, আবাদ করা সাহসী কৃষক এবং মণ্ডলীর সমবেত সত্তা। এই কথকতায় গাঙ্গেয় বাংলার মতো রাজপুত্রের কাহিনী নেই, আত্মসচেতনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা উদ্যত নয়। এই নৈতিকতায় ব্যক্তিগত ভক্তিও কম। টুসু, ভাদু—এরা উপলক্ষ মাত্র ; যদিও মনে হতে পারে এই কথকতার ভিত্তি দেবী আর মানুষের মাঝে সংলাপ—'তুমি' আর 'আমি'—কিন্তু দৈবী শক্তির সাথে মানবী অস্তিত্বের সম্পর্ক আর বিষয় নয়। এই দৈবী শক্তিরা অনেকটা সূত্রধরের মতো। ভাদু কথা ধরিয়ে দেবেন—তারপর সংলাপ মূলত সমাজগত, আত্মগত। দৈবী অস্তিত্ব শুধু 'সাউণ্ডিং বোর্ড'।

জামবনির রাজবংশকথা ও লোকায়ত কথার দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে কমিউনিটি বা **সমাজ** কীভাবে প্রতীকী পথে গঠিত হচ্ছে। অ্যানিথনি কোহেন এর নাম দিয়েছেন, **দা সিমবলিক কন্সট্রাকশন অব কমিউনিটি**। এই গঠনে অতীত প্রতীকরূপে বিধৃত। আচারাদিই হল সেই প্রতীক। এতে সমাজ বা কমিউনিটির পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা আছে। এবং এতে এই সমাজের সীমানাও নির্ণীত হয়েছে—নানা সীমানা। ক্ষমতার সীমানা, এলাকাগত সীমানা, সম্প্রদায়গুলির সীমানা, লোকভাবনার সীমানা।

তার চেয়েও বড় কথা, এই প্রতীকী গঠনের মধ্যে রয়েছে আচার, রজনীতি এবং ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্কের ছাপ। এই আন্তঃসম্পর্কই জামবনির বিভিন্ন ভাষণিক ধারাকে বিশিষ্ট করেছে। আচার বলতে এই লেখায় আমি শুধু কিছু ক্রিয়াকর্মাদি বোঝাইনি, সমগ্র প্রতীকী প্রক্রিয়াকে বোঝাতে চেয়েছি। সমাজতত্ত্ববিদদের সাক্ষ্য মানতে পারি, ডুর্কহাইম আচার সম্পর্কিত ব্যবহারকে অতিপ্রাকৃত জগতের সাথে যুক্ত করেছিলেন, যদিও এ ব্যাখ্যাও সঠিক যে ডুর্কহাইমের কাছে দেবতার আরাধনা হল সেই মাধ্যম যার

স্বারা মানুষ নিজের সমাজকেই আরাধনা করে, নিজেদের পারম্পরিক নির্ভরশীলতাকে। ডুর্কহাইমের কাছে আচারাদি ছিল দু রকমের—পবিত্র এবং পার্থিব বা নৈমিত্তিক, সাধারণ। স্যাক্রেড আর প্রফেন। কিন্তু জঙ্গলমহলের, বিশেষত জামবনির আচারাদির মধ্যে এই ভাবনার সমর্থন পাওয়া দুষ্কর। কেননা আচারাদি এখানে একই সঙ্গে পবিত্র এবং পার্থিব, বিশেষ এবং সাধারণ, ঋতু / সময় বিশেষ এবং নৈমিত্তিক। আচারাদির বারোমাস্যা জড়িত রয়েছে ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে, রাজনীতির সঙ্গে।

ক্ষমতার কাঠামো যেমন আচার সৃষ্টি করে, আচারাদিও ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়। ন্যায্যতা এনে এবং অপার্থিবকরণ সৃষ্টি করে তা রহস্যময়তা যোগ করে এবং এইভাবে আচারাদি ক্ষমতাকে দৃঢ় করে। এই কাজ আরও সম্ভব হয় তার কারণ আচারের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে অস্পষ্টতা বা **অ্যামবিগুইটি**। রাজনৈতিক বাস্তবতার আচার-কেন্দ্রিক গঠনও সম্ভব হয়ে হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে আচার নিজেই হয়ে ওঠে ক্ষমতা বা শক্তি। সংঘর্ষ বা সংকটের ক্ষেত্রটি লোকমানসে বা সমাজমানসে কী রূপ পরিগ্রহ করবে, তা নির্ভর করতে থাকে আচারাদির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মধ্যে। ছো, লোকগীতি, পর্ব, কথকতা, ধর্মচরণ—জামবনির সংস্কৃতির আলোচনায় এগুলোর উল্লেখের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছি যে, রাজনীতি এবং ক্ষমতার প্রসঙ্গ ব্যতীত আচারের জগত বোঝা যাবে না। ফ্রেজার এখানে অচল : সম্ভবত অচল লেভিস্ত্রাউসও। অচল 'তপ্ত সমাজ' ও 'শীতল সমাজের, হট সোসাইটি, কোল্ড সোসাইটি'র কল্পকাহিনী।

৮

সংস্কৃতির ইতিহাস আছে বলে তাই থামা যাবে না। সংস্কৃতি ইতিহাস সৃষ্টিও করে। এই দ্বান্দ্বিকতার দিকে কিছুটা নজর ফেলে লেখার ইতি টানব।

একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। জামবনিতে প্রথম বার তিনেক আমাদের যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটত ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সম্পর্কিত আইন শৃঙ্খলা সমস্যায়। একবার ঝাড়গ্রাম থেকে ওঁদিকে আর রেল যাচ্ছে না ; আরেকবার চিলকিগড়ে এদিক- ওদিক ঘুরতে মানা হল, কারণ, কাল সি পি এম ঝাড়খণ্ডির হাতে মার খেয়েছে, আজ ঝাড়খণ্ডি খুন হয়েছে—অন্তহীন শোধ-প্রতিশোধের আবর্ত—এই আর কি ; আরও এক বার পুলিশের গাড়িতে 'সভ্যতায়' ফেরত এলাম ; মনে পড়ছে এমনই ঘরবন্দী হয়ে গিয়েছি ওই একই কাজে পুরুলিয়ায় গিয়ে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা আর বামফ্রন্টের পালা করে পর পর ডাকা পুরুলিয়ায় হরতাল চলেছে। সবচেয়ে বেশি মনে আছে, জামবনি থানায় ঢুকেছি পুরনো ভিলেজ নোটবুক দেখতে। দারোগাবাবুর ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো কাঁচে ঢাকা ছবি—**ম্যাপ অব জামবনি, ঝাড়খণ্ডি ইনফেস্টেড ভিলেজেস**। এই যেমন বলি ডাকাত অধ্যুষিত, সন্ত্রাসবাদী অধ্যুষিত, তেমনই ঝাড়খণ্ডি অধ্যুষিত। এক কথায় বলা যায়, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ছায়ায় আমার অনুসন্ধান, মেলামেশা চলেছিল। কাজেই সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার কথাটা এসে পড়েছে স্বাভাবিকভাবে, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে।

আমি উল্লেখ করেছি, জামবনির কথা লিখতে গিয়ে বারবার জঙ্গলমহলের কথা এসে পড়েছে। জঙ্গলমহলের কথা বলতে গিয়ে ঝাড়খণ্ডের কথা। সময় এবং এলাকার সীমানা দুরতিক্রম্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ বোধের প্রভাবে এই অবস্থা! কিন্তু আমাদের মেতে হবে 'জাতীয় মানসিকতা' বা ন্যাশনাল আইডেনটিটি গড়ে ওঠার কথায়; তার কারণ যে এলাকার কথা আমাদের আলোচনার বিষয়, সেই এলাকার কথা তার বহুতর যোগাযোগ সম্পর্কাদি ব্যতীত অর্থবহ হয়ে ওঠে না। আমি দেখিয়েছি, জামবনির সংস্কৃতি এবং আচারের ধরনটি কীভাবে ন'মহলের অন্যত্রও পাওয়া যাবে এবং অন্য এলাকার উল্লেখের পরিপ্রেক্ষিতেই ফিরে আসা যাবে জামবনির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রহস্যোন্মচনের কাজে। এই সব সাংস্কৃতিক আচারাদি কোন জাতির / জাতীয় ইতিহাস রচনা করছে? নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীর মতো হিতেশ সান্যাল হয়ত বলতেন, এটা রাঢ় বাংলার প্রভাব, রাঢ় বাংলার কথা। ঐতিহাসিক বলে বিনোদশংকর দাশ লিখেছেন, এটা সীমান্ত বাংলার কথা, দঃ পশ্চিম সীমান্ত। পাক্কা সাহেবরা আলাদা এক প্রশাসনিক অস্তিত্বই এনেছিল কিছু বছরের জন্য হলেও—বলেছিল, এটা জঙ্গলমহল। এগুলো ঠিক একই অঞ্চল নয়, যদিও একটা ধারাবাহিকতা রয়ে গছে। তাই আজ একই বই নতুন নতুন পাঠে নতুন নতুন অর্থ এনে দেয়। একই ছবি ভিন্ন সময়ে মানসপটে ভিন্ন স্মৃতি বহন করে। একই এলাকার ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি। তাই আজ ঝাড়খণ্ডেরর জাতীয় পরিচিতি পাবার আন্দোলনের কালে, এই অঞ্চলের জনসাধারণ দাবি করবে এটা ঝাড়খণ্ড গড়ে ওঠার সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ঝাড়খণ্ড বলে যে সব অঞ্চলকে একই সত্তার অন্তর্গত বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই অঞ্চলগুলির সাংস্কৃতিক উপাদানের সমপ্রকৃতি এই দাবির এক বড় ভিত্তি। আমি নিজে সাক্ষী আছি, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়, এক গায়ক উঠে ঘোষণা করলেন, আমরা 'ঝুমুর দেশের' লোক। এই গায়ক ময়ূরভঞ্জের। এইভাবে স্বদেশীযুগে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি বলত, আমরা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলার মানুষ।

ইতিহাস এক সক্রিয় বিদ্যা হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদের যুগে। ভারতের জাতীয়তাবাদী বিকাশে ভারত ইতিহাসচর্চা ওইরকম এক ভূমিকা নিয়েছিল। একইভাবে ঝাড়খণ্ডের জাতিসত্তাগত / জাতীয় চেতনার বিকাশের প্রক্রিয়ায় এই সাংস্কৃতিক ইতিহাস এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। বলা যায়, সংস্কৃতি ইতিহাসের উপাদান, ইতিহাসচর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিসত্তাগত চেতনা বাড়ার সাথে সাথে জামবনির কৃষ্টির অখ্যাত রূপকাররা পাদপ্রদীপের সামনে আসবেন। ছো নাচিয়ে, ঝুমুর গাইয়ে, নাচনি, মাহাত সমাজ সংস্কারক, মন্দিরের নকশাবিদ, কথক, পালাকার, মুখোশশিল্পী কারিগর, মানভূম ধলভূমের গাঁয়ের কবিরাল—অতীতের বিস্মৃতপ্রায় এই মানুষেরা হবেন এই নতুন ইতিহাসের সাংস্কৃতিক রূপকার।

জাতীয়তাবাদ এবং জাতিসত্তাগত চৈতন্য বিকাশের ধাক্কায় অহল্যার শাপমুক্তি হবে।

জাতিকথা বা নৃকথার অধীনতা থেকে ইতিহাসের মুক্তি ঘটবে। লোকসংস্কৃতির উত্তরণ ঘটবে এথনোগ্রাফি থেকে ইতিহাসে। আচারের আলোচনায় রাজনীতির প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ জাতিসত্তার বা জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপেই সংস্কৃতি রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠেছে। শাসক অর্থনীতি, রাজনীতি ও কৃষ্টির বিরোধিতা করে যে রাজনৈতিক চৈতন্যের অগ্রগতি, সেই চৈতন্যই স্থির করে দিচ্ছে লোকায়ত কৃষ্টিকে কোন এক জাতীয়-গণতান্ত্রিক ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠতে হবে ॥ □

আমি এই লেখার জন্য নির্মলেশ ধবলদেবের কাছে ঋণী। সুরজিৎ সিংহ, পশুপতি মাহাত, নিরঞ্জন মাহাত এবং চন্দ্রমোহন মাহাতর সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত এই লেখা সম্ভব হতো না। —লেখক।

এই নিবন্ধটিতে পাদটীকা-দ্যোতক সংখ্যা অগ্রাহ্য করুন। —সম্পাদক।

পরিশিষ্ট—১

জামবনি এস্টেট থেকে শিক্ষায় মাসিক সাহায্য ও বেতন (১৩৪১-৪২)

১।	সিদ্ধেশ্বর মিত্র	৩২ টাকা ছ আনা
২।	ধড়ষা স্কুলের সাহায্য	২ টাকা
৩।	বনসারা ,, ,,	২ টাকা
৪।	ঘাটখুড়া ,, ,,	২ টাকা
৫।	রামচন্দ্রপুর ,,	২ টাকা
৬।	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যায়তন, চিলকিগড়	৫৪ টাকা আট আনা
		৯৪ টাকা চোদ্দ আনা

পরিশিষ্ট—২

জামবনি এস্টেটের থেকে মাসিক দেবসেবা বাবদ বেতন (১৩৪১-৪২)

১।	শ্রীশ্রী শিবজিউ ঠাকুরের পূজারী কৃত্তিবাস আচার্য্য	২ টাকা	
২।	কৃত্তিবাস আচার্য্য পূজক	১১ টাকা ছ আনা	
৩।	উজলা বেওয়া	২ টাকা	ইহার নামে ২ টাকা হাওলাত আছে। মাসিক আট আনা আদায় হয়।
৪।	রাজেন্দ্র শতপথী	১৬ টাকা চোদ্দ আনা	
৫।	বালক বাগাল	১ টাকা	
৬।	বিহারী মাঝি	১ টাকা	
৭।	কৈলাস মাঝি	১ টাকা	
৮।	কুসুম বেওয়া	১ টাকা	
		৩৬ টাকা চার আনা	